গল্পে হযরত উমর (রা)
ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত উমর (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত উমর (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

গল্পে হযরত উমর (রা)

ইকবাল কবীর মোহন

প্রকাশনায়	শিশু কানন
	৩০৭ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা
	ফোন : ০১৭৩০ ৩৩০৪৩০
প্রকাশকাল	জানুয়ারি ২০১৩
ছাপা	সফিক প্রেস
প্রচ্ছদ	মুবাশ্বির মজুমদার
মূল্য	৭০.০০ টাকা মাত্র

The Story of Hazrat Umar (R)

Iqbal Kabir Mohon, Published by Shishu Kanon

Price : Taka 70.00

উৎসর্গ

আমার পরম
শ্রদ্ধাভাজন আম্মা জোহরা বেগমের
মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে
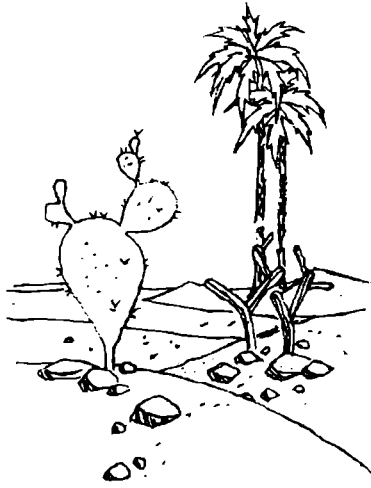
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূ মি কা

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত সর্বজনীন জীবনবিধান। দুনিয়ার সেরা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এই শ্রেষ্ঠ বিধানকে সফলভাবে দুনিয়ায় কায়েম করে গেছেন। এ জন্য তাঁকে অনেক অনেক দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। মহানবী (সা)-এর প্রিয় সাহাবীরাও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কম চেষ্টা করেননি। তাঁদের সবার চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই সাহাবীরাও সবার কাছে সমাদৃত ও সম্মানিত।

এসব সাহাবীর মধ্যে ইসলামের চার খলিফা ছিলেন অন্যতম। তাঁদের বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং গুণাবলি এখনও আমাদের কাছে আলোর দিশা হয়ে আছে। তাই এ চারজন বিশিষ্ট খলিফার জীবন ও কর্ম জানা থাকা আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রয়োজন। আজকের দুনিয়ার চরম ও সীমাহীন নৈতিক

অধঃপতনের যুগে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনের নানা দিক যেমন আলোচনা করা প্রয়োজন, তার পাশাপাশি চার খলিফার জীবনকেও অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের শিশু-কিশোরদের সামনে তাঁদের চরিত্রমাধুর্যের চিত্র তুলে ধরা খুবই জরুরি। এর ফলে আমাদের শিশু-কিশোররা অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং এই শিক্ষার আলোকে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে।

'গল্পে হযরত উমর (রা)' বইটিতে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার জীবনের সামান্য কিছু দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি মনে করি, আমাদের সোনামণি শিশু-কিশোররা বইটি পড়ে আমাদের প্রিয় খলিফার জীবন ও চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে। এতে তাদের জীবন হবে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও পবিত্র। বড়রাও এ বই থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহ্ আমাদের এ নগণ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

ইকবাল কবীর মোহন
৩০৭ রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।
ফোন : ৮৩২১৭৪০

জন্ম ও বংশ পরিচয়

প্রায় চৌদ্দশ বছর আগের কথা। তখন আরবের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। সমাজে মানুষের অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। লোকেরা প্রায় সবাই অজ্ঞতা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তারা সর্বদা মারামারি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকত। মানুষ নানা বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে আরবের মাটিতে প্রায়ই খুন ঝরত। মানুষের নিরাপত্তা বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে মানুষের সমাজ হয়েও আরব ভূমি তখন একটা নরকে পরিণত হয়েছিল।

মরুময় আরবের এমনি দুর্যোগময় মুহূর্তে পবিত্র মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন বীর পুরুষ হযরত উমর (রা)। সে সময় আরবের মক্কা নগরীতে বেশ কয়েকটি নামকরা গোত্র বাস করত। এ রকম একটি গোত্রের নাম আদ্দি। এ গোত্রেই হযরত উমর ফারুক (রা) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর মা বাবা তাঁকে 'হাফস' বলে ডাকতেন। তবে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল উমর। প্রকৃতপক্ষে,

তিনি হযরত উমর ফারুক নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। আজও গোটা বিশ্বের মানুষ তাঁকে এ নামেই চেনে। 'ফারুক' তাঁর গুণবাচক নাম। 'ফারুক' শব্দের অর্থ 'সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী।'

হযরত উমর ফারুকের পিতার নাম খাত্তাব। তিনি তদানীন্তন আরব সমাজের একজন প্রভাবশালী লোক ছিলেন। আদ্দি বংশেরও একজন নামকরা ব্যক্তি ছিলেন খাত্তাব।

হযরত উমর (রা)-এর মায়ের নাম 'হানতামা।' তিনি ছিলেন হিশাম ইবনে মুগিরার পরম আদরের কন্যা। হিশাম ইবনে মুগিরা তখনকার আরবে নামকরা সেনাপতি এবং সাহসী যোদ্ধা বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পৌত্র ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। ইসলামী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি হলেন ওয়ালিদ।

'জাবালে আকিব' নামে আরবে এক বিখ্যাত পাহাড় ছিল। এ পাহাড়ের পাদদেশে ছিল আদ্দি বংশের লোকেদের বসতি। তারা এ পাহাড়ী এলাকায় অনেকদিন থেকে বসবাস করত। হযরত উমর (রা) এ পাহাড়ী এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন।

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে 'আকিব' পাহাড়টির মর্যাদা বহুলাংশে বেড়ে যায়। এটিকে নতুনভাবে নামকরণ করা হয়। হযরত উমর (রা)-এর নামানুসারে পাহাড়টির নামকরণ করা হয় 'জাবালে উমর' অর্থাৎ উমরের পাহাড়।

হযরত উমর (রা) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর বয়স ছিল মাত্র তের বছর। এ হিসেব মতে হযরত উমর (রা) সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর তের বছরের ছোট।

উমর (রা) বেশ সুঠামদেহী ও স্বাস্থ্যবান মানুষ ছিলেন। শুধু শারীরিক শক্তিই নয়, উমর (রা)-এর বুক ভরে ছিল অসীম সাহস। তাঁর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মাথায় টাক ছিল। হযরত উমর (রা)-এর ঘন দাড়ি ও দীর্ঘাকৃতি শরীর সবার নজর কাড়ত। তিনি প্রকৃত অর্থেই একজন সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর সাহস ও বীরত্বের কথা সারা বিশ্বের মানুষ ভালো করেই জানত।

বড় হয়ে হযরত উমর (রা) খোলাফায়ে রাশেদার দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তবে উমর (রা)-এর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। কৈশোরে উমর (রা)-এর পিতা তাঁকে উটের রাখালের কাজে লাগিয়ে

দেন। তিনি মক্কার কাছে 'দাজলান' নামক স্থানে উট চরাতেন। এভাবে ধীরে ধীরে এ মহামানব দুনিয়ার নামকরা মানুষে পরিণত হন।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত উমর (রা) কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

২. তিনি কোন বংশে জন্ম নেন?

৩. তাঁর পিতা ও মাতার নাম কী?

৪. হিশাম ইবনে মুগিরা কে ছিলেন?

৫. উমর (রা)-এর প্রকৃত নাম কী?

ছেলেবেলা ও জ্ঞান অর্জন

হযরত উমর (রা) যখন দুনিয়ায় এলেন তখন সমগ্র আরবদেশ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অধিকাংশ মানুষ ছিল মূর্খ ও নিরক্ষর। তারা ছিল অনেকটা বর্বর প্রকৃতির। সে সময় পড়ালেখার তেমন একটা প্রচলন ছিল না। তখন না ছিল স্কুল-বিদ্যালয়, না ছিল মক্তব কিংবা মাদ্রাসা। ফলে ইচ্ছা

থাকলেও কেউ জ্ঞান লাভের সুযোগ সুবিধা পেত না। সমাজে জ্ঞান প্রসারের তেমন কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। হাতে গোনা গুটিকতেক মানুষ তখন ভালো লেখাপড়া জানত। তবে সেসব পড়ালেখা আজকালকার মতো অতটা আধুনিক ছিল না। উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তখন কল্পনা করাও যেত না। তাই সে অন্ধকার যুগের লেখাপড়া ছিল খুবই সাদাসিধে ও মামুলি ধরনের।

ফলে হযরত উমর (রা) পারিবারিকভাবে শিক্ষালাভের তেমন একটা সুযোগ পাননি। তবে তা টাকা-পয়সার অভাবের কারণে হয়েছিল এমনটি নয়। তখন তো আর আমাদের মতো অফিস-আদালত ছিল না। কারও চাকরি-বাকরির তেমন প্রয়োজনও হতো না। আজকাল খেয়ে পরে বাঁচার জন্য লেখাপড়া যেমন প্রধান মাপকাঠি বিবেচিত হয়, তখনকার যুগে তার কল্পনাও ছিল না। তাই লেখাপড়ার প্রয়োজনও ছিল খুব সীমিত। কেউ ইচ্ছে করলে কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারত। হযরত উমর (রা)ও এভাবে কিছু বিদ্যা লাভ করেছেন এবং তা তাঁর নিজের প্রেরণা থেকে শিখেছেন।

আরবে তখন পুঁথিগত বিদ্যার ওপর কোনো জোর ছিল না। জ্ঞান অর্জন বলতে যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশতালিকা জ্ঞানকেই বুঝানো হতো। হযরত উমর (রা) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও ধীশক্তি সম্পন্ন যুবক। তাই অল্প বয়সেই তিনি যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি ও বংশতালিকা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তখন এসব বিষয়ে তাঁর মতো জ্ঞানী লোক খুব কমই খুঁজে পাওয়া যেত।

ফলে হযরত উমর (রা)-এর নাম সহসাই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কবিতা লেখার ওপর তিনি বেশ পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রচুর কবিতা লিখে গেছেন। আজও আরবী সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁর এসব মহা মুল্যবান কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা)-এর মধ্যে যে কাব্য প্রতিভা ছিল তা অনেককেই হতবাক করত। তখনকার যুগের খ্যাতনামা কবিদের প্রায় সব কবিতাই তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। এভাবে হযরত উমর (রা) ভাষাজ্ঞান ও আরবী সাহিত্যে খ্যাতনামা হয়ে ওঠেন।

রাসূলে কারীম (সা) যখন নবুয়ত লাভ করেন, তখন খ্যাতনামা কুরাইশ বংশে মাত্র সতেরজন লোক লেখাপড়া জানত। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত উমর (রা)। সাহিত্যের পাশাপাশি জ্ঞানের উমর (রা)-এর নাম শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠত। জেনেশুনে কোন লোক তাঁর সামনে সহজে দাঁড়াতে সাহস পেত না।

প্রাথমিক জীবনে উমর (রা) ছিলেন ইসলামের ঘোর শত্রু। তিনি ইসলামকে মোটেও পছন্দ করতেন না। তবে পরিণত বয়সে এসে হযরত উমর (রা) ইসলাম কবুল করে সত্যের আলোয় নিজেকে রঙিন করে তুলেন। সেই সময় তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবী (সা)-এর হাদীসের ওপর প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। এসব বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি ফেকাহ্ জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সে যুগে ফেকাহ্ জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি অনেক হাদীস সংগ্রহ করেছেন। এসব হাদীস সংকলন করা ছিল উমর (রা)-এর অন্যতম মহান কীর্তি।

হযরত উমর (রা) শুধু জ্ঞানী বলেই পরিচিত ছিলেন না। তিনি একজন সহজাত বাগ্মী ছিলেন। তিনি ভালো বক্তৃতা করতে পারতেন। তাঁর সুনিপুণ বাগ্মিতা দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত। সবমিলে হযরত উমর (রা) তৎকালীন আরবের একজন খ্যাতনামা বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে সর্বমহলে পরিচিত ছিলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত উমর (রা) কিভাবে লেখাপড়া শিখেছিলেন?

২. উমর (রা) কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন?

৩. কবিতার ওপর উমর (রা)-এর কেমন দখল ছিল?

৪. উমর (রা)-এর আর কী বিশেষ গুণাবলি ছিল?

উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ছোটবেলা থেকেই উমর (রা) ছিলেন এক দুরন্ত ও ডানপিটে বালক। তাঁর ছিল অসীম সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা। ইসলামকে তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। ইসলামের নাম গন্ধও তার কাছে অসহ্য বলে মনে হতো। তাই ইসলামকে কিভাবে শেষ করা যায় এ চিন্তা ও কাজে তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। কেউ ইসলাম কবুল করেছে শুনলেই উমর ক্ষেপে আগুন

হয়ে যেতেন। এ জন্য তাঁর হাতে বহু নও-মুসলিম নির্যাতিত হয়েছিল। অনেক আত্মীয়-স্বজনও ইসলাম কবুল করে উমর (রা)-এর অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

উমর (রা)-এর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যায়িদের পুত্র সাঈদ সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। সাঈদ উমর (রা)-এর ভগ্নিপতি এবং বোন ফাতিমার স্বামী। বোন ফাতিমাও গোপনে ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু এ খবর উমর (রা) জানতেন না। তিনি যখন জানলেন তখন তিনি রাগে ক্ষোভে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। তাদের শায়েস্তা করতে তিনি ছুটে গেলেন বোনের বাড়িতে। আর এ ঘটনার মধ্য দিয়েই উমর (রা)-এর জীবনে ঘটে গেল এক অভাবনীয় পরিবর্তন। অবশেষে তিনি নিজেও মহান ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হলেন। তাই উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক।
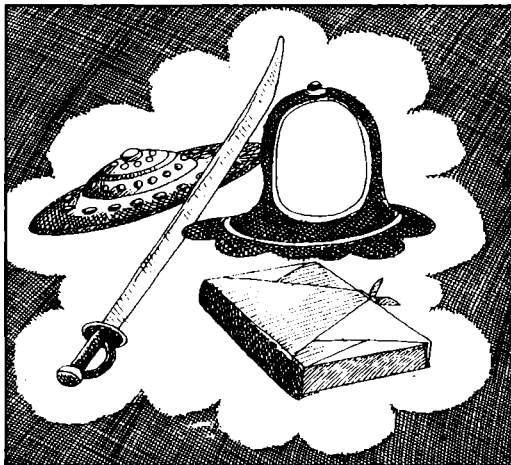
উমর (রা)-এর মতো মক্কার আরো যারা বড় বড় নেতা ছিল তারাও ইসলামের ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ছিল। সুযোগ পেলেই তারা ইসলামের মূল উৎপাটন করার চেষ্টা করত। নও-মুসলিম কাউকে পেলে এসব কাফের-মোশরেকও তাদের ওপর নিপীড়ন চালাত। তারা মুসলমানদের ওপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাদের সবার প্রধান টার্গেট ছিলেন ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। তারা নবী (সা)-কেও সহ্য করতে

পারল না। মক্কার কাফের-মোশরেক সবার একটাই ভাবনা ছিল, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর দীনের কাজকে একেবারে শেষ করে ফেলতে হবে। যদি প্রয়োজন হয়, মুহাম্মদ (সা)-কেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। মহানবী (সা)-এর অপরাধ, তিনি সমাজের মানুষের কাছে নতুন এক ধর্ম প্রচার করছেন। তাদের ভাষায়, মুহাম্মদ (সা) আরব সমাজে অশান্তির ও অনাচার সৃষ্টি করছেন এবং সহজ-সরল মানুষকে তিনি বিপথে পরিচালনা করছেন। আরও অভিযোগ ছিল, সমাজের যুবকদের তিনি পথভ্রষ্ট করছেন। কাফেররা আরো বলল যে, মুহাম্মদ (সা) তাদের বাপ-দাদার ধর্ম ও নীতিকে অস্বীকার করছেন। কাফের মোশরেকদের ভাষায়, মুহাম্মদ (সা)-এর এ কাজ মস্ত বড় অন্যায়। এটা নীতিবিরোধী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধের সামিল। তাই তারা বলল, এ অন্যায় কাজকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না।

এদিকে দেখতে দেখতে অনেকেই মহানবী (সা)-এর দীনকে গ্রহণ করে ফেলেছে। তাই মুহাম্মদ (সা)-এর কাজকে আর বাড়তে দেয়া যায় না। এখনই এর মূল উৎপাটন করা চাই– এই প্রতিজ্ঞায় একমত হলো কাফের-মোশরেকরা। তারা সবাই এক হলো, জোট বাঁধল।

অনেক ভেবেচিন্তে মক্কার কাফের-মোশরেকরা একদিন একত্রে বসার সিদ্ধান্ত নিলো। তাই নদওয়া নামক স্থানে এক যৌথসভা ডাকা হলো। সভায় সম চিন্তার সবাইকে দাওয়াত দেয়া হলো। নির্দিষ্ট সময়ে আবু লাহাব, আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানসহ কাফেরদের সব বড় বড় নেতা সেখানে গিয়ে হাজিরা দিলো। আজ তাদের বৈঠকের এজেন্ডা একটাই। মুহাম্মদ (সা)-এর কাজকর্ম কিভাবে শেষ করা যায়। এ নিয়ে তারা অনেক আলোচনা করল। অনেক সলা-পরামর্শ করা হলো। অবশেষে সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ঠিক করা হলো, যে কোনো মূল্যে হোক না কেন, মুহাম্মদ (সা)-কে মেরে ফেলতে হবে।

কাফের-মোশরেকদের সবাই ভালো করেই জানত যে, মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার কাজটি খুব সহজ হবে না। তাই তারা মুহাম্মদ (সা)-এর ঘাতকের জন্য লোভনীয় ও আকর্ষণীয় পুরস্কার ঘোষণা করল। ঠিক হলো– যে নবীকে মারতে পারবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও এক হাজার উট পুরস্কার দেয়া হবে। সেই যুগে এই পুরস্কার ছিল সত্যিই অভাবনীয়। তাই এ লোভনীয় পুরস্কার পাবার জন্য অনেকের মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি হলো।

পুরস্কার ঘোষণা করার সাথে সাথেই এটা নিয়ে অনেকে কানাঘুষা করতে লাগল। তবে কেউ কোনো কথা বলল না। ফলে এক সময় নদওয়ার সভা জুড়ে নীরবতা নেমে এলো। কারও মুখ থেকে কোনো কথা সরছে না। মজার ব্যাপার হলো– মহানবী (সা)-কে হত্যা করার মতো সাহস কারও বুকে জন্মাল না। এত বিশাল ও লোভনীয় পুরস্কার, অথচ আল্লাহর কি শান! কেউ এ কাজে এগিয়ে আসতে রাজি হলো না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই নীরবতা ভেঙ্গে হঠাৎ একজন গর্জে উঠলেন। তিনি হলেন মহাবীর উমর। তাঁর চোখে-মুখে বেশ দৃঢ়তা দেখা গেল। শরীরে বেশ উত্তেজনা লক্ষ করা গেল। তিনি নবী (স)-কে হত্যা করার জন্য দৃপ্ত শপথ ঘোষণা করলেন। কাফের নেতারা তো মহাখুশি। তারা ভাবল, এ বিরাট কাজ উমরের মতো সাহসী বীর ছাড়া আর কেউ করার সাহস পাবে না। উমর যেহেতু দায়িত্ব নিয়েছে, তখন আর চিন্তার কারণ নেই, কাজ এবার হবেই হবে।
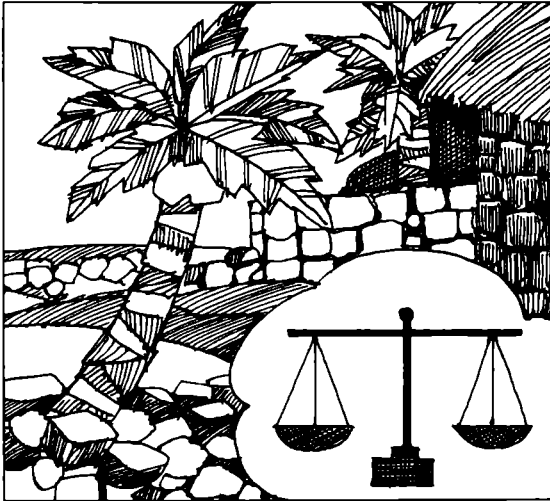
উমর আর দেরি করলেন না। তিনি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরে প্রচণ্ড রাগ, ক্ষোভ ও চরম উত্তেজনা পরিলক্ষিত হলো। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন উমর। প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে তাঁর তেজি ঘোড়া। বাতাসের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলছেন তিনি। তাঁর সামনে একটাই লক্ষ্য– যে করেই হোক, মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করতে হবে।

পথ চলতে চলতে এক সময় বন্ধু নঈমের সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেল। নঈম লক্ষ করল, উমর বেশ বিচলিত, উত্তেজিত। উমরকে সে ভালো করেই জানে। তাই বিষয়টা নঈমের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হলো না। তার কিছু একটা সন্দেহ হলো। একটা কিছু করতে যাচ্ছে উমর– এটা ভেবে উমরকে ডেকে দাঁড় করালো নঈম। শত হলেও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই উমর থেমে দাঁড়ালেন। নঈম উমরকে বলল, 'কি ব্যাপার, খুব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছ যে? তোমাকে খুব পেরেশান মনে হচ্ছে, কোনো সমস্যা হয়নি তো?'

উমর তড়িঘড়ি জবাব দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বেশ তাড়া আছে। কী বলবি বল। আমি যাচ্ছি মুহাম্মদ (সা)-এর মাথা কাটতে।'

নঈম বলল, 'আচ্ছা বেশ। মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করতে যাচ্ছ তো ভালো কথা। তবে তুমি কি জানো, তোমার বোন ফাতিমা ও তার স্বামী সাঈদ ওরা দু'জন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছে? পারো তো আগে ওদের সামলাও। মুহাম্মদেরটা পরে দেখ।'

নঈমের মুখে বোন ও সাঈদের খবর শুনে উমর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁর নিজের বোনই ইসলাম গ্রহণ করে বসে আছে! অথচ এ উমর যাচ্ছে মুহাম্মদ (সা)-এর মাথা কাটতে? এ কী অবাক করা কথা! উমর বিস্মিত হলেন। তাঁর মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল। উমর আর স্থির থাকতে পারলেন না।

উত্তেজিত উমর এবার তার গতি পরিবর্তন করলেন। ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন বোনের বাড়ির দিকে। মুহূর্তের মধ্যেই উমর বোনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। ঘরের বাইরে থাকতেই তাঁর কানে কিছু একটা পাঠ করার শব্দ ভেসে এলো। বোন ও সাঈদ তখন পবিত্র কুরআন শরীফ পড়ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই তারা উমরের উপস্থিতি টের পেয়ে গেলেন। ফলে দু'জনই ভীত হয়ে পড়লেন। কেননা, উমরকে তারা ভালো করেই জানেন। তারা বুঝতে পারলেন, আজ আর রক্ষা নেই। তাই তারা তড়িঘড়ি করে কুরআনের আয়াতটি লুকিয়ে ফেললেন।

দেখতে দেখতে উমরও সহসাই ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। উমরের রক্তচক্ষু দেখে বোন ও ভগ্নিপতি ভয়ে কাঁপছিলেন। তারা জড়োসড়ো হয়ে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘরে প্রবেশ করেই উমর ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'বল, তোরা কী পড়ছিলে? কোনো কিছু লুকাবার চেষ্টা করো না। আমি সব খবরই জানি।'

ভগ্নিপতি সাঈদ ভাবলো উমরের কাছে সত্য গোপন করে কোনো লাভ নেই। আর মিথ্যাই বা বলবেন কী করে। তারা যে মুসলমান। তাই তিনি উমরের কাছে যা সত্য তাই খুলে বললেন।

সাঈদ অকপটে স্বীকার করে নিলেন তাদের ধর্ম পরিবর্তনের কথা। তিনি বললেন, 'আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছি। আমরা জেনেশুনেই তাঁর সত্য ধর্মকে মেনে নিয়েছি।'

সাঈদের কথা শেষ হতে না হতেই উমর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আর যায় কোথায়! প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত উমর ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভগ্নিপতিকে ভীষণ মারধর করলেন। সাঈদের ওপর আঘাতের পর আঘাত করতে দেখে বোন ফাতিমা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাই তিনি স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন। ভাইকে বারবার বুঝানোর চেষ্টা করলেন ফাতিমা।

কিন্তু উমর এতটাই ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, তাঁকে সামলানো সম্ভব হলো না। উমর রাগের চোটে বোনের শরীরেও হাত ওঠালেন। উমরের মারের চোটে বোনের শরীর কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তবে তাতেও উমরের রাগ পড়ল না, বরং তিনি আরো উত্তেজিত হলেন।

এবার তিনি বোন ও ভগ্নিপতিকে চোখ রাঙিয়ে ধমকাতে লাগলেন। তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে চাপ দিলেন। ওদের জানে মেরে ফেলারও হুমকি দিলেন। কিন্তু তারা দৃঢ়ভাবে উমরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা বললেন, 'আমরা জেনেবুঝে মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমরা আল্লাহর সত্য দীনকে খুঁজে পেয়েছি। তুমি যত পার আমাদের আঘাত করো, তাতে আমরা মরে যাব তবুও মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম ছাড়তে পারব না।'

বোন ও ভগ্নিপতির মুখে এমন ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা দেখে উমর অবাক হলেন। তাঁর মনে ধাক্কা খেল। তিনি ভাবলেন, তাদের ওপর কত অত্যাচার করা হলো, তবু তারা ভয় পাচ্ছে না! এত কষ্ট পেয়েও তারা ইসলাম ছাড়ছে না! ইসলামের প্রতি ফাতিমা ও সাঈদের এ প্রচণ্ড আকর্ষণ লক্ষ করে উমর চমকে গেলেন। হঠাৎ তার মনে কী যেন এক ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। তিনি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। তাঁর মনের জোর যেন ভেঙে পড়ল। খানিকক্ষণ তিনি অবাক বিস্ময়ে বোনের সুন্দর ও নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। উমরের চোখ যেন আটকে গেল বোনের পবিত্র চেহারার ঝলকে। তিনি আর ভাবতে পারছেন না। কিছুক্ষণ পর তাঁর সম্বিত ফিরে এলো।

উত্তেজিত উমর এতক্ষণে বেশ শান্ত হয়ে পড়েছেন। এবার তিনি নরম কণ্ঠে স্নেহের বোনকে কাছে ডাকলেন। তাকে পাশে বসিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বলতো, তোরা কী পড়ছিলে? আমাকে এটা দেখাবে কী?'

বোন ফাতিমা ভাই উমরের মনের আমূল পরিবর্তন দেখে খুশি হলেন। তিনি খুশিতে যেন নেচে উঠলেন। তার চোখেমুখে অনাবিল তৃপ্তির রেখা ফুটে উঠল। খুশিতে আত্মহারা বোন ফাতিমা প্রিয় ভাই উমরকে বললেন, 'শুনতে চাও ভাই, আমরা কী পড়ছিলাম? তা হলে শোন, আমরা আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন পড়ছিলাম। কুরআন অতি পবিত্র গ্রন্থ। এটি মহান প্রভু আল্লাহর কিতাব। তুমি যদি এটা হাতে নিয়ে দেখতে চাও তা হলে ওজু করে পবিত্র হয়ে এসো। পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর এ কালাম স্পর্শ করা যাবে না।'

বোনের মুখে এমন মধুর কথা শুনে উমরের হৃদয়তন্ত্রীতে যেন এক শীতল মুলায়েম পরশ অনুভূত হলো। তিনি মোমের মতো নরম হয়ে গেলেন। বোনের কথামতো হযরত উমর (রা) পবিত্র হয়ে এলেন। এবার বোন ফাতিমা সূরা ত্বাহা ও হাদীদের আয়াতগুলো উমরের সামনে তুলে ধরলেন। উমর (রা) পরম যত্নসহকারে সূরা ত্বাহা ও হাদীদের আয়াতগুলো একবার পাঠ করলেন। পবিত্র কুরআনের অর্থবহ ও আবেগময় আয়াত পড়ে উমর অতিশয় অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরে এক প্রশান্তির শিহরণ যেন খেলে গেল। ওদিকে উমর (রা)-এর মনের ভেতরও এক অলৌকিক তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। মুহূর্তে উমর (রা)-এর হৃদয় সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

মহামতি উমর (রা) আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাই সূরা ত্বাহা পড়া শেষ করে তিনি বোনকে বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই এটা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছ থেকে পেয়েছ? আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল। আমি নবী মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাব। আর দেরি করতে রাজি নই। এখনই আল্লাহর দীনের নিয়ামত আমি গ্রহণ করতে চাই। চল যাই, এসো।'

যেই কথা সেই কাজ। উমর অতি দ্রুত মহানবী (সা)-এর কাছে ছুটে গেলেন। উমরকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে মহানবী (সা) তো হতবাক। উমর (রা)-এর চোখ ও অভিব্যক্তি দেখে আল্লাহর নবী (সা) সবই বুঝতে পারলেন। তাই তৃপ্তি আর খুশিতে নবী (সা)-এর মন ভরে উঠল। উমর (রা) মহানবী (সা)-এর পবিত্র ও নূরানী মুখের দিকে তাকাতেই অভিভূত হয়ে পড়লেন।

উমর (রা) মহানবী (সা)-কে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী, আমি আজ সবই বুঝতে পেরেছি। সত্য ও সুন্দরের পরশ আমাকে পরাজিত করেছে। আমার একটাই চাওয়া-আমি পবিত্র ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। আমাকে আপনি কালিমা পরিয়ে পবিত্র করুন এবং মুসলমান হবার সুযোগ দান করুন।'

উমর মহাবীর। একটু আগেও তিনি ছিলেন মুসলমানদের জানি দুশমন। অথচ এ দুঃসাহসী উমর মহানবী (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়েছে ইসলাম কবুল করতে। এ যে কী মহাখুশির বার্তা তা কিভাবে প্রকাশ করবেন মহানবী (সা)? তাঁর চোখেমুখে সেই খুশির ঝিলিক যেন ঠিকরে পড়ছিল। মহানবী (সা) উমরকে কালেমা পড়িয়ে দিলেন। মহানবী (সা)-এর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন মহাবীর উমর। আল্লাহর নবী এ জন্য মহান খোদার শুকরিয়া আদায় করলেন। উমর (রা) মুসলমান হয়ে যেন এক নতুন জীবন পেলেন। যে নবীকে হত্যা করতে শপথ নিয়েছিলেন উমর, সে উমরই নবী (সা)-এর ধর্ম গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। তিনি সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে এখন এক প্রভুর গোলামে পরিণত হলেন।

এদিকে কাফের-মোশরেকরা উমরের কাজের ফলাফল জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তারা ভাবছিল, কখন উমর এসে বলবে– এই নাও মুহাম্মদ (সা)-এর মাথা। আমি তোমাদের আশা পূরণ করেছি। এবার আমার পুরস্কার আমাকে বুঝিয়ে দাও।' আর তারা সবাই উমরের কাছ থেকে এ খবর শুনে নেচে গেয়ে উল্লাস করবে, আনন্দ উপভোগ করবে।

এটা যখন কাফেরদের অবস্থা, তখন শোনা গেল উল্টো ঘটনা। কাফেরদের কানে এলো এমন এক খবর যা তাদের মেজাজকে বিগড়ে দিলো। তারা শুনতে পেল বীর উমর ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেছেন। এতে আবু লাহাব, আবু জাহেল ও আবু সুফিয়ানসহ কাফের নেতারা ক্ষোভে ও জেদে নিজেদের মাথার চুল টানতে শুরু করল। তাদের সবার মুখে একই কথা। একি জঘন্য অপরাধ করল উমর! আজ দেখি সেও বাপদাদার ধর্ম ছেড়ে বিপথে পা বাড়াল!

কাফেরদের শিবিরে যখন এ দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থা, তখন মুসলিম জনগণের মধ্যে দেখা গেল খুশির বন্যা। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের খবর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল মক্কায়। খবর শুনে মুসলমানরা হলো মহাখুশি। আর কাফের-মোশরেকদের মনে ঢুকল ভীষণ ভয়। উমর (রা)-এর মতো

একজন মহাবীরের মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে যোগদানকে তারা বিপদের নমুনা হিসেবে দেখতে পেল। উমর (রা) ইসলাম কবুল করেই দীনের কাজে লেগে গেলেন। ফলে ইসলামের শক্তি আরো মজবুত হলো এবং ইসলাম প্রচারের কাজ বেশ বেগবান হলো।

ব ল তে পা রো ?

১. নদওয়ার বৈঠকে কী সন্ধান্ত হয়েছিল?

২. মহানবী (সা)-কে মারার জন্য কী পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল?

৩. কে আল্লাহর নবী (সা)-কে মারার জন্য উদগ্রীব ছিলেন?

৪. পথিমধ্যে কার সাথে উমর (রা)-এর দেখা হলো?

৫. উমর (রা)-এর বোন ও ভগ্নিপতির নাম কী?
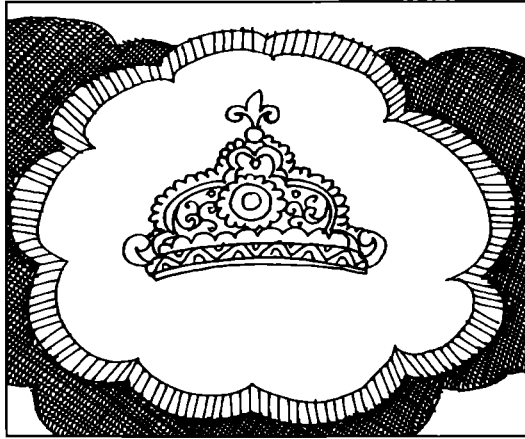
খলিফারূপে হযরত উমর (রা)

উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইতোমধ্যেই মক্কার কাফেরদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। এতে তারা উমর (রা)-এর ওপর বেশ ক্ষুব্ধ হলো। উমর (রা) সাহসী বীর পুরুষ। যুগের শ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে তাঁর বেশ নাম ছিল। উমর (রা)-এর নাম শুনে ভয় পেত না এমন লোক আরবে কেউ ছিল না।

তাই কাফের-মোশরেকরা উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে বেশ ঘাবড়ে গেল। ওদিকে উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণে মুসলমানরা যারপরনাই খুশি হলো। কেননা, এতদিন উমর ছিল তাদের কাছে আতংক। উমর (রা) মুসলমানদের অনেক কষ্ট দিয়েছেন। আজ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এতে মক্কায় ইসলামের শক্তিও অসম্ভব রকম বেড়ে গেল।

ইসলাম কবুল করার পর উমর (রা)-এর জীবন একেবারে বদলে গেল। তিনি ইসলামের বড় মাপের এক সেবকে পরিণত হলেন। উমর (রা) আর বসে থাকতে পারলেন না। তাই ইসলাম প্রচারের কাজে লেগে গেলেন। ফলে ইসলামের আলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। এতে ইসলাম প্রচারের কাজ গতি লাভ করল।

মুসলমানদের সরাসরি ইসলামের কাজ করার সুযোগও সৃষ্টি হলো। তিনি ইসলাম কবুল করার পর মহানবী (সা)-এর সাথে বহু জেহাদে অংশ নিলেন। বহু জেহাদ তিনি নিজ দায়িত্বে পরিচালনা করেন।উমর (রা)-এর জীবন ছিল জ্ঞান ও বিদ্যা, বুদ্ধি ও কৌশল, সাহস ও উদ্যমের আলোয় ভরপুর। ফলে তাঁর যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ অচিরেই সবার সামনে উদ্ভাসিত হলো।

এ কারণে অতি অল্প সময়ে তিনি মুসলমানদের বিরাট নেতারূপে গণ্য হলেন। বিভিন্ন জেহাদে উমর (রা) তাঁর সাহসিকতা ও নেতৃত্বের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। বদর, ওহুদ, খন্দকসহ আরো অনেক যুদ্ধে উমর (রা) রাসূলে (সা)-এর সাথে থেকে অগ্রসৈনিকের দায়িত্ব পালন করেন।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উমর (রা) রাসূল (সা)-কে আগলে রেখে ছায়ার মতো সঙ্গ দান করেন। হযরত আবু বকর (রা) খলিফা হলে উমর (রা) তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচিত হন। হযরত আবু বকর (রা) ৬৩৪ সালে ইন্তেকালের পর মুসলমানরা সবাই মিলে হযরত উমর (রা)-কে খলিফা নির্বাচিত করেন। ফলে তিনি মুসলিম দুনিয়ার দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

উমর (রা) খলিফা হবার পর ইসলাম আরও গতিশীলতা লাভ করল। তাঁর সফল নেতৃত্ব ও সাহসী ভূমিকার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র দ্রুত বড় হতে থাকল। বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হলেন উমর (রা)।

এত বড় শাসক হলে কী হবে? এতে উমর (রা)-এর জীবনে কিন্তু কোনো পরিবর্তন এল না। তিনি আগের মতো স্বাভাবিক ও সহজ-সরল জীবনযাপন

করতে লাগলেন। উমর আগে যা ছিলেন তাই থেকে গেলেন, বরং উমর (রা) মানুষের সেবায় আরো বেশি উদ্যোগী হলেন।

হযরত উমর (রা) অর্ধ দুনিয়ার খলিফা। রাষ্ট্রের বায়তুলমালের মালিক তিনি। তারপরও দেখা গেল তিনি অনেক সময় অনাহারে ও অর্ধাহারে জীবন কাটিয়েছেন। বায়তুলমাল থেকে তিনি কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না। ফলে গোটা দুনিয়ায় তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইতিহাস ঘেটে দেখা যায়, মহামতি উমর (রা)-এর মতো এমন রাষ্ট্রনায়কের মুখ আজও দেখেনি দুনিয়ার মানুষ। উমর (রা) ১০ বছর ৬ মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

ব ল তো পা রো ?

১. উমর (রা) কখন খলিফা হলেন?

২. বায়তুলমালের ব্যাপারে হযরত উমর কী ভাবতেন?

৩. উমর (রা)-এর জীবনযাপন প্রণালি কেমন ছিল?

৪. উমর (রা) কতদিন খেলাফত পরিচালনা করেন?

সাম্যের প্রতীক উমর (রা)

হযরত উমর (রা)-এর খেলাফত আমলের এক ঘটনা। ঘটনাটি একজন সাহাবীর ছেলেকে নিয়ে ঘটেছিল। সাহাবীর নাম আমর ইবনুল আস। তিনি ছিলেন খুবই উঁচু মানের একজন সাহাবী। জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য দেশজুড়ে তাঁর বেশ পরিচিতি ছিল। তাঁর মেধা ও যোগ্যতা তাঁকে অনেক সুনাম এনে দিয়েছিল। খলিফা উমর (রা) তাই আমর ইবনুল আসকে মিসরের বাদশাহ নিযুক্ত করেন।

বাদশাহ আসের এক পুত্রের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। বাবা মিসরের বাদশাহ। তাই আবদুল্লাহ নিজেকে অনেক কিছু ভাবত। বাদশাহর ছেলে হবার গর্বে

সে কাউকে পরোয়া করতে চাইত না। বাবার বাদশাহি নিয়ে সে বরং অহঙ্কার করত। তার অহঙ্কার একসময় সীমা ছাড়িয়ে গেল।
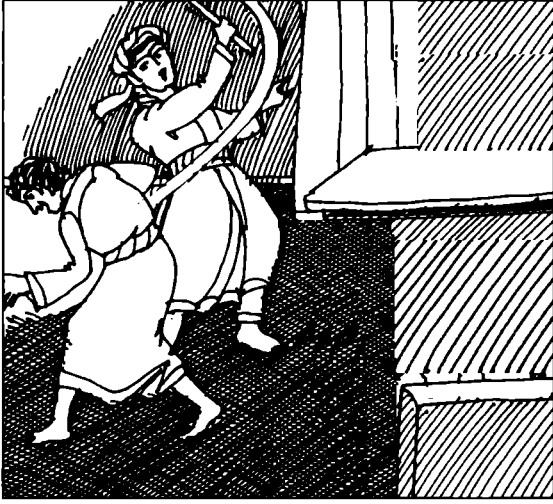
একদিন আবদুল্লাহ গর্বের বশে এক অতি সাধারণ কিতবীকে অযথা জ্বালাতন করল। সে সময় কিবতীরা ছিল ক্রীতদাসের মতো। সমাজে তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হতো। কিবতীকে নিপীড়ন করার খবর উমর (রা)-এর কানে এসে পৌঁছাল। এ ঘটনা শুনে খলিফা উমর (রা) মনে বেশ দুঃখ পেলেন।

হযরত উমর (রা) বললেন, 'আল্লাহর কাছে সব মানুষই তো সমান। মানুষের মধ্যে ছোট বড় বলে কেউ নেই। দুনিয়ায় কেউ ক্রীতদাস নয়, আবার কেউ প্রভুও নয়। তাই কিবতীর প্রতি আসের পুত্রের আচরণ তিনি সহ্য করতে চাইলেন না। তিনি এ ধরনের ঘৃণ্য আভিজাত্য এবং অহঙ্কার ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করলেন। তাই উমর (রা) আমর ইবনুল আস ও তার পুত্রকে দরবারে ডেকে আনলেন। অত্যাচারিত সে কিবতীকেও ডেকে আনা হলো। উদ্দেশ্য উমর (রা) আবদুল্লাহর অত্যাচারের সুবিচারের ব্যবস্থা করবেন।

কিবতীর এ বিচারের খবর দেশের সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেল। তাই এ ঘটনা দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ এসে রাজধানীতে জড়ো হলো।

বিচারে খলিফা কী রায় দেন, তা জানতে অনেক মানুষ কৌতূহলী হলো। অনেকে আবার উমর (রা)-এর কঠিন শাস্তির কথা ভেবে ভয়ও পেয়ে গেল।

উমর (রা)-এর আদালতে একদিন যথাসময়ে বিচার কাজ শুরু হলো। উমর (রা) কিবতীকে সব কথা খুলে বলতে আদেশ দিলেন। কিবতী আদালতে নিসংকোচে তার সব কথা খুলে বলল।

উমর (রা) কিবতীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। সব শুনে উমর (রা) দেখলেন আবদুল্লাহ অন্যায়ভাবে কিবতীকে জ্বালাতন করেছে। সাক্ষ্য প্রমাণের পর উমর (রা) তাঁর বিচারের রায় ঘোষণা করলেন।

হযরত উমর (রা) আবদুল্লাহকে বেত্রাঘাত করার আদেশ দিলেন। উমর (রা) কিবতীকে বললেন, 'আব্দুল্লাহ তোমাকে যতগুলো আঘাত করেছে, তুমিও তত জোরে তাকে ততগুলো আঘাত করো।'

খলিফার রায় শুনে কিবতী হতবাক হলো। খলিফার কাছে ন্যায়বিচার পেয়ে তার মন ভরে গেল। এ ন্যায়বিচার তাকে অভিভূত করল। কিন্তু সে ভয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। বাদশাহ আসের ছেলে আবদুল্লাহকে নিজ হাতে শাস্তি দিতে কিবতী ভয় পেল এবং এ জন্য সে অপারগতা প্রকাশ করল।

কিন্তু খলিফা কিবতীর ভয়কে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'শোন কিবতি, এটা খলিফার রায়। এ রায় অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। তোমার কোনো ভয় নেই। যা আদেশ দেয়া হয়েছে তাই পালন করো।'

অবশেষে কিবতী ভয়ে ভয়ে একটি বেত হাতে তুলে নিলো। এ সময় দরবারের সবাই ছিল চুপচাপ। চারদিকে তখন পিনপতন নীরবতা।

এদিকে ভয়ে কাঁপছে অপরাধী আবদুল্লাহও। কিবতী বেত হাতে এগিয়ে গেল। সে আবদুল্লাহকে বেত দিয়ে সাধ্যমত আঘাত করল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলো বাদশাহ আসের ছেলে আবদুল্লাহর শরীর।

এভাবে হযরত উমর (রা) আব্দুল্লাহর আভিজাত্য ও অহমিকাকে ধুলায় মিশিয়ে দিলেন। সে যে বাদশাহর ছেলে, এর কোনো মূল্যই দিলেন না ন্যায়বান খলিফা।

বাদশাহর ছেলের অন্যায়ের বিচার করে হযরত উমর (রা) সাম্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. আস (রা) কোন এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন?

২. কিবতী কারা ? তাঁদের একজনকে কে জ্বালাতন করল?

৩. উমর (রা) কিবতীর নালিশের কী বিচার করলেন?

৪. উমর (রা)-এর আদেশ কিভাবে কার্যকর করা হলো?

এক প্রজাবৎসল খলিফা

হযরত উমর (রা) ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল খলিফা। প্রজাদের সুখ-শান্তি ও কল্যাণ নিয়েই ছিল তাঁর যত চিন্তা। তিনি সবসময় প্রজাদের কথাই ভাবতেন। সারাদিন রাষ্ট্রের কাজকর্ম সম্পাদন করেও খলিফার মন ভরত না। প্রজারা কেউ কোথাও কষ্ট পাচ্ছে কি না, কোথাও কারও অভাব-অনটন আছে কিনা, তা নিয়ে খলিফা উমর (রা) চিন্তা করতেন। প্রজাদের কথা ভাবতে গিয়ে অনেক সময় রাতেও তাঁর চোখে ঘুম আসত না।

প্রজারা কে কোথায় আছে, কিভাবে আছে– তা নিয়ে তিনি রাতে বিছানায় শুয়েও ভাবতেন। তাই অনেক সময় তিনি বিছানা ছেড়ে অস্থির হয়ে উঠে পড়তেন এবং প্রজাদের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য তিনি মদীনার অলিগলিতে একাকী ঘুরে বেড়াতেন।

একদিনের এক ঘটনা। তখন গভীর রাত। কোথাও কোনো আলো পর্যন্ত নেই। রাজধানী মদীনার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও জন-মানবের নাম গন্ধ নেই। চারদিকে ঘন কালো অন্ধকার। এমন সময় মদীনার অন্ধকার রাস্তায় একাকী বেরিয়ে পড়লেন খলিফা উমর (রা)। রাজপথ ধরে হাঁটছেন তিনি। আর প্রজাদের খবর নেয়ার চেষ্টা করছেন। প্রজারা কিভাবে আছে, না আছে তা নিজ চোখে দেখার চেষ্টা করছেন।

এমন সময় একটু দূরে মরুভূমিতে গিয়ে তাঁর চোখ আটকে গেল। ক্ষীণ একটি আলো তাঁর চোখে পড়া। কিন্তু এত গভীর রাতে এ আলো খলিফার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হলো না। তাই দ্রুত পায়ে তিনি আলোটার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কাছাকাছি গিয়ে একটি কুঁড়েঘরের পাশে থমকে দাঁড়ালেন।

হযরত উমর (রা) দেখতে পেলেন, এক মহিলা একটি চুলোয় হাঁড়ি বসিয়ে পানি জ্বাল দিচ্ছেন। মহিলার পাশে কয়েকটি শিশু শুয়ে বসে করুণভাবে কাঁদছে। উমর (রা) অনেকক্ষণ ধরে এ দৃশ্য অবলোকন করলেন। তিনি লক্ষ করলেন, সময় অনেক পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ মহিলার রান্না যেন শেষ হচ্ছে না। এদিকে কেঁদে কেঁদে হয়রান ছেলেমেয়েরা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

এ দৃশ্য দেখে খলিফার মনে ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হলো। তিনি বিষয়টি জানার জন্য মহিলাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন-'মা! আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছি আপনি চুলোয় পানি জ্বাল দিচ্ছেন। কিন্তু আপনার রান্না যে শেষ হচ্ছে না। আপনার ছেলেমেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল, অথচ আপনি হাঁড়িতে শুধু জ্বালই দিয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা বলুন, আপনি এ চুলোয় কী জ্বাল দিচ্ছেন?'

উমর (রা)-এর প্রশ্ন শুনে মহিলার চোখ ছলছল করে উঠল। সে খলিফাকে চিনত না। অজানা লোক। এত গভীর রাতে এখানে এসেছে। মহিলার একটু ভয় ভয়ও লাগছিল। তবু লোকটিকে তার ভালো বলেই মনে হলো। মহিলা লোকটির প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল। তার বুক ভরে যে সীমাহীন দুঃখ।

মহিলা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুক্ষণ পর উমর (রা)-কে বলল, 'শুনন বাবা, আপনি কে আমি জানি না। তবে আমার বিশ্বাস আপনি অবশ্যই ভালো লোকই হবেন। জানতে চেয়েছেন যখন তাই বলি, খিদের জ্বালায় আমার ছেলেমেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করছিল। অথচ আমার ঘরে কোনো খাবার নেই। কি আর করি, কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই ওদের ভুলাবার জন্য কিছু পাথর ও পানি হাঁড়িতে বসিয়ে জ্বাল দিচ্ছিলাম। ভাবছিলাম রান্না হচ্ছে মনে করে ছেলেমেয়েরা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য হলেও অপেক্ষা করবে।'

এভাবে মিছেমিছি পানি জ্বাল দিয়ে অন্তত আজ রাতের জন্য হলেও ওদের ভুলিয়ে রাখতে পারতাম। এ ছাড়া যে কোনো পথ আমার ছিল না বাবা। আমি মহিলা মানুষ। আমার আয়রুজি বলতে কিছু নেই। কিভাবে ওদের খাওয়া জোগাড় করি বলুন? আজ ক'দিন ধরে ওরা খেয়ে না খেয়ে আছে।' কথাগুলো বলতে বলতে মহিলা আবার হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিলো।

মহিলার এ হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে খলিফা উমর (রা)-এর মন কেঁপে উঠল। এ অভাবী সংসারের করুণ অবস্থা দেখে খলিফার দু'চোখ ভরে অশ্রু নেমে এলো। তাঁর হৃদয়তন্ত্রী যেন ছিঁড়ে যাচ্ছিল। এতগুলো অবুঝ ছেলেমেয়ের করুণ অবস্থা খলিফাকে যারপরনাই ব্যথিত করল। খলিফা মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'অপেক্ষা করুন মা! আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমি এখনই আসছি। আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছি। আমি আসছি। আপনি অপেক্ষা করুন।'

একথা বলেই খলিফা উমর (রা) ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেলেন বায়তুলমালের ভাণ্ডারের দিকে। গভীর রাতে তাঁর গোলাম আসলামাকে ডেকে তুললেন। তারপর বায়তুলমাল থেকে কিছু আটা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে একটা বোঝা বাঁধলেন। আসলামা বুঝতে পারলেন এ বোঝা অবশ্যই কাউকে সাহায্য হিসেবে দেবেন খলিফা। আসলামা বোঝাটি কাঁধে নিতে চাইলেন। কিন্তু খলিফা তাতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'না, আমি নিজেই নেবো এ বোঝা। তুমি এটা আমার কাঁধেই তুলে দাও।'

খাদ্যভর্তি বোঝা নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই খলিফা গিয়ে পৌঁছলেন তাঁবুতে। আটা দিয়ে মহিলাকে রুটি বানাতে বললেন। আর খলিফা নিজ হাতে রুটি সেঁকলেন। তারপর হালুয়া দিয়ে রুটিগুলো ছেলেমেয়েদের পেট ভরে

খাওয়ালেন। এতে ছেলেমেয়েদের মুখে ফুলের পবিত্র হাসি ফুটে উঠল। মহিলার বুকও সীমাহীন তৃপ্তিতে ভরে উঠল ।

নিরন্ন অবুঝ শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে খলিফা উমর (রা)-এর চোখেমুখেও তৃপ্তির বেহেশতী আভা ফুটে উঠেছে। একটি অসহায় ও ছিন্নমূল পরিবারের সেবা করতে পেরে মহান খলিফা পরম করুণাময় আল্লাহতাআলার শুকরিয়া আদায় করলেন।

উমর (রা) এমনই প্রজাবৎস ছিলেন। তাঁর জীবনে প্রজাসেবার এমন বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

ব ল তে পা রো ?

১. প্রজাসেবার জন্য খলিফা উমর (রা) কী করতেন?

২. তিনি রাতের বেলায় কেন রাজধানীতে একাকী ঘুরে বেড়াতেন?

৩. একরাতে তিনি কোথায় গিয়ে দাঁড়ালেন? মহিলা তখন কী করছিল?

৪. মহিলার জন্য খলিফা কী করলেন?

বায়তুলমালের রক্ষক

ইসলামী রাষ্ট্রের তহবিলকে সোনালী যুগে বায়তুলমাল বলে অভিহিত করা হতো। রাষ্ট্রের জনগণের যাবতীয় ব্যয়ভার এখান থেকেই নির্বাহ করা হতো। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে খলিফারা বায়তুলমালকে খুব সতর্ক ও সততার সাথে পরিচালনা করতেন।

বায়তুলমাল নিয়ে এক চমৎকার ঘটনা ঘটেছিল হযরত উমর (রা)-এর আমলে। একদা হযরত উমর (রা) বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর শরীরের তাপমাত্রা বেশ বেড়ে

গেল। তাঁকে প্রয়োজন মতো সব চিকিৎসাই করা হলো। কিন্তু তাতেও তেমন কাজ হচ্ছিল না। খলিফার জ্বর সারার লক্ষণ দেখা গেল না। তাই উমর (রা)-এর অসুস্থতা নিয়ে মদীনার জনগণ শংকিত হয়ে পড়ল। তারা খলিফার নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল। খলিফার চিকিৎসার ব্যাপারে তাই তারা অস্থির হয়ে পড়ল। অনেক হেকিমের খোঁজখবর নেয়া হলো। অবশেষে দেখে শুনে এক হেকিম ডেকে আনা হলো। হেকিম সাহেব খলিফার সার্বিক অবস্থা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলেন। সব দেখে হেকিম মোটামুটি একটা পরিকল্পনা নিলেন। খলিফার জন্য ঔষধ তৈরি করবেন তিনি। তাই হেকিম জানালেন, 'ঔষধ বানাতে হলে কিছু মধু দরকার।' কিন্তু খলিফার ঘরে ঔষধ বানাবার মতো মধু ছিল না। খবর নিয়ে জানা গেল বায়তুলমালে প্রচুর মধু জমা আছে। কেউ কেউ বায়তুলমাল থেকে মধু আনার জন্য প্রস্তাব করল। কেউ কেউ বলল, 'জলদি চলো, বায়তুলমাল থেকে মধু নিয়ে আসি।'

উমর (রা) সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, 'তোমরা বায়তুলমাল থেকে আমার জন্য মধু আনতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছ। এটা কেমন করে হয়? বায়তুলমাল তো জনগণের সবার সম্পদ। এ সম্পদ খলিফার একার নয়। তাই নিজের জন্য এ মধু ব্যবহার করার সাধ্য আমার নেই। যত প্রয়োজনই হোক না কেন, জনগণের মতামত ছাড়া বায়তুলমাল থেকে মধু নেয়া যাবে না।'

খলিফার শরীরের অবস্থা ছিল বেশ নাজুক। তাঁর জীবন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তিনি যে গুরুতর অসুস্থ। অথচ তিনি বায়তুলমালের মধু গ্রহণ করতে চাইলেন না। এ ব্যাপারে সম্মতি দেয়ার জন্য সবাই খলিফাকে প্রচণ্ড চাপ দিতে লাগল। তাঁকে নানাভাবে বুঝানো হলো।

সবার চাপের মুখে খলিফা অবশেষে রাজি হলেন। তিনি শর্তজুড়ে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা এক কাজ করো। জনগণের কাছ থেকে সম্মতি নাও। তাদের সম্মতি পেলেই কেবল বায়তুলমাল থেকে মধু নেয়া যাবে। তার আগে নয়।'

কিন্তু এ সম্মতি নেয়াটা খুব সহজ ছিল না। জনগণের সম্মতি পেতে হলে শুক্রবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার। জুমার নামাযের দিন বলে তখন সবাইকে একত্রে পাওয়া যাবে এবং তাদের সম্মতি পাওয়া, না পাওয়া নিয়ে আলাপ করা যাবে। পরিশেষে ঠিক করা হলো, জুমার দিন মসজিদে নববীতে যারা নামায পড়তে আসবেন তাদের নিকট বিষয়টি বিস্তারিত খুলে বলা হবে। তাদের কাছেই খলিফার জন্য প্রয়োজনীয় মধুর অনুমতি চাওয়া হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাই করা হলো। দেখতে দেখতে শুক্রবার ঘনিয়ে এলো। মুসল্লীরা সবাই মসজিদে এসে জড়ো হয়েছেন। তাদের কাছে খলিফার অসুস্থতার কথা জানানো হলো। আর তাঁর ঔষধ বানাতে যে মধুর প্রয়োজন তাও জনগণকে জানানো হলো। একই সাথে বায়তুলমাল থেকে মধুর পাওয়ার জন্য সবার কাছে অনুমতি চাওয়া হলো। খলিফার জন্য বায়তুলমাল থেকে মধু পেতে অনুমতি দরকার এ কথা শুনে মসজিদের মুসল্লিরা বেশ হতবাক হলো। একি অবাক কথা শুনছেন তারা! বায়তুলমালের মালিক খলিফা নিজে। অথচ মুসল্লিরা তার ব্যাপারে কী অনুমতি দেবেন?

তারা সবাই এ ব্যাপার নিয়ে কানাঘুষা করতে লাগল। কি মহান খলিফারে বাবা! বায়তুলমালের ব্যাপারে খলিফার এ ধরনের অনুভূতি সত্যিই বিস্ময়কর। খলিফার আমানতদারি তাদের সবাইকে হতবাক করে দিলো। কি মহান মানুষ তাদের প্রিয় খলিফা। অনেকে খলিফার খোদাভীতি দেখে চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারল না। তাদের মন খলিফার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় যেন সিক্ত হলো। মসজিদের মুসল্লী সবাই খলিফার সুস্থতার জন্য যত প্রয়োজন মধু বায়তুলমাল থেকে নিতে সম্মতি দিলো। তারপর তারা সবাই দু'হাত তুলে খলিফার আরোগ্যের জন্য প্রাণভরে দোয়া করল।

ব ল তে পা রো ?

১. একদিন খলিফার কী হলো ?

২. হেকিম কেন মধু আনার তাগাদা দিলেন?

৩. খলিফা বায়তুলমাল থেকে মধু আনতে নিষেধ করলেন কেন?

৪. মধুর জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া হলো?

৫. মুসল্লীরা খলিফার আরোগ্যের জন্য কী ব্যবস্থা নিলেন?

উমর (রা)-এর জবাবদিহিতা

খলিফা উমর (রা)-এর আমলের এক ঘটনা। দিনটি ছিল এক শুক্রবার। জুমার নামাযের দিন। সেদিন মসজিদে নববীতে ঘটল এক বিরল ঘটনা। জুমার নামায আদায় করতে মুসল্লিরা নববীতে এসে একত্রিত হয়েছে। আজ নামাযে ইমামতি করবেন স্বয়ং খলিফা হযরত উমর (রা)। দেখতে দেখতে নামাযের সময় ঘনিয়ে এলো। খলিফা উমর (রা) যথাসময়ে মসজিদে গিয়ে হাজির হলেন।

হযরত উমর (রা) খুৎবা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। এ জন্য তিনি মিম্বরে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক এমন সময় এক যুবক কী এক কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়াল। খলিফাকে লক্ষ্য করে যুবক বলল, 'হে মহান খলিফা, আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে। আগে আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন, তারপর আমি আপনার খুতবা শুনব।'

হঠাৎ করে যুবকের এ ধরনের চোখা কথা শুনে মসজিদের মুসল্লীরা কান খাড়া করল। এত বড় খলিফাকে এভাবে শর্ত দিয়ে কথা বলায় সবাই হতবাক হলো। কেউ কেউ যুবকের এ আচরণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করল। মসজিদে মুসল্লী সবার মধ্যে এ নিয়ে বেশ কানাঘুষা শুরু হলো।

যুবকের কথা শুনে হযরত উমর (রা) কিন্তু বিচলিত হলেন না। তিনি যুবককে অভয় দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে যুবক, তুমি প্রশ্ন করতে চাও করো, শুনি তোমার কী কথা আছে? আমি অবশ্যই তোমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে খুতবা পড়ব। ভয় নেই, তুমি কী বলতে চাও বলো।'
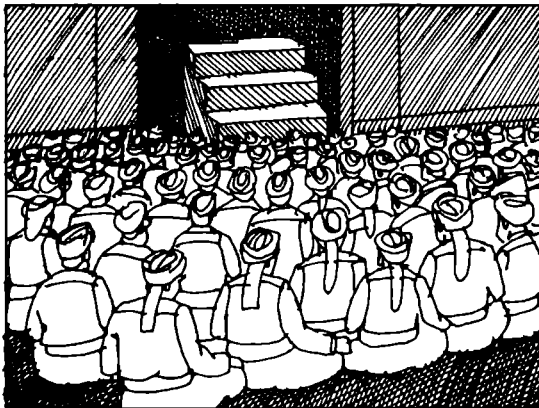
খলিফার অনুমতি পেয়ে যুবকটি বলল, 'আমার কথা হলো, কয়েকদিন আগে বায়তুলমাল থেকে আমরা সবাই কাপড় পেয়েছি। হে মহান খলিফা! একই কাপড় আপনি নিজেও পেয়েছেন। অথচ আমি লক্ষ করলাম, আপনার পরনের জামাটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক লম্বা। এটা এতটা লম্বা যে, মনে হয় আপনি বেশি কাপড় দিয়ে তা বানিয়েছেন। আমার ধারণা আপনি বায়তুলমাল থেকে আপনার জন্য বেশি কাপড় নিয়েছেন। আপনি মুসলিম জাহানের খলিফা। বায়তুলমালের মালিক আপনি। তাই বলেই কি আপনি বায়তুলমাল হতে কাপড় বেশি নিয়ে লম্বা করে জামা বানিয়েছেন?'

যুবক যখন কথা বলছিল তখন মসজিদের অন্যান্য মুসল্লি বেশ উত্তেজনা অনুভব করছিল। যুবকের এ ধরনের অবান্তর ও অসংলগ্ন কথা তাদের কারও পছন্দ হলো না। তাই যুবকের ওপর অনেকের বেশ রাগ হচ্ছিল। অথচ হযরত উমর (রা) যুবকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তিনি যুবকের কথায় মোটেও বিচলিত হলেন না।

খলিফা বরং শান্তভাবে যুবকের প্রশ্নের জবাব দিতে মুখ খুললেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যুবককে

উদ্দেশ করে বললেন, 'হে যুবক! আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই জান, আমিও তোমার সাথেই বায়তুলমাল থেকে এক টুকরো কাপড় পেয়েছি। আমি সেটা দিয়ে জামা বানাইনি। এটা আমার বাবাকে আমি দিয়ে দিয়েছি। যাতে তিনি তা দিয়ে তাঁর জামাটা লম্বা করে বানাতে পারেন। খলিফা আমার কাপড়সহ নিয়ে জামা বানিয়েছেন বলে তাঁর জামাটি অতটা লম্বা হয়েছে।'

খলিফার ছেলে আব্দুল্লাহর উত্তর শুনে প্রশ্নকারী যুবক স্তব্ধ হয়ে গেল। অযথা খলিফাকে প্রশ্ন করে লোকজনের সামনে তাঁকে বিব্রত করায় সে সীমাহীন লজ্জা পেল। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। ফলে সে তার চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল। যুবকটির অনুতাপের যেন শেষ নেই। এবার সে তার অযথা খারাপ ধারণার জন্য বিনীতভাবে দুঃখ প্রকাশ করল।

অথচ খলিফা কী মহান! কতই না সুন্দর তার চিন্তা-ভাবনা। তিনি যুবকের কথা শুনে হাসলেন। তিনি যুবককে কোনো কঠোর কথাই বললেন না, বরং খলিফা গভীর তৃপ্তি ও শোকরিয়ার সাথে বললেন, 'হে মুসল্লী ভাইয়েরা, খলিফা জেনেও আমাকে কঠোর প্রশ্ন করতে লোকেরা যে ভয় পায় না সেটাই আল্লাহর অশেষ রহমত। কেননা, আমিও তো মানুষ। আমিও অন্যায় করে ফেলতে পারি। তাই যদি অন্যায় পথে চলি তা হলে আমাকে সংশোধন করার মতো লোকের অভাব নেই।'

খলিফা উমর (রা) যুবকের প্রশ্নের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে খুৎবা শুরু করলেন।
জবাবদিহিতার কী চমৎকার নজীরই না স্থাপন করলেন আমাদের প্রিয় খলিফা হযরত উমর (রা)!

বলতে পারো ?

১. একদিন জুমার দিন মসজিদে কী ঘটল?
২. যুবকের প্রশ্নটি কী ছিল?
৩. কে যুবকের প্রশ্নের জবাব দিলেন?
৪. যুবকের প্রশ্নের জবাবে খলিফা কী বললেন?
৫. এ ঘটনা থেকে আমরা কী শিখতে পারি?
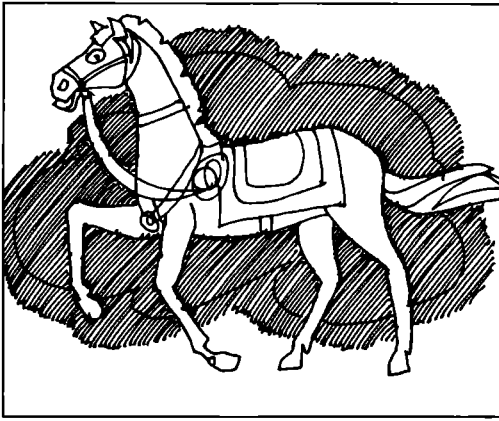
নিরহঙ্কার মানুষ হযরত উমর (রা)

একদিনের এক ঘটনা। বাইরে থেকে কিছু গণ্যমান্য লোক এলেন মদীনায়। তারা ইসলামের খলিফা হযরত উমর (রা)-এর সাথে দেখা করতে এসেছেন। অনেক খোঁজ-খবর নেয়ার পর তারা অবশেষে হযরত উমর (রা)-এর বাসায় গিয়ে হাজির হলেন। কিন্তু খলিফাকে বাসায় পাওয়া গেল না। মেহমানরা ভাবলেন খলিফা হয়তো মসজিদে থাকতে পারেন। তাই তারা বাসা থেকে ফিরে মসজিদে নববীতে গিয়ে হাজির হলেন।

সেখানে গিয়েও তারা হতাশ হলেন। মসজিদে খলিফার সন্ধান পাওয়া গেল না। তাই অতিথিরা বেশ অস্থির হয়ে খলিফার খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। এ জন্য তারা ছুটলেন বিভিন্ন জায়গায়। অবশেষে খলিফার সন্ধান পাওয়া গেল।

তারা দেখতে পেলেন-উমর (রা) একটা উটকে ধরার জন্য উটটির পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছেন। কিন্তু তিনি উটটি ধরতে পারছিলেন না। খলিফার এই অবস্থা দেখে লোকেরা যারপরনাই অবাক হলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আহনাফ বিন কায়েস। তিনি খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। তিনি বুঝাতে চাইলেন, তিনি একজন খলিফা। উট ধরার কাজ খলিফার জন্য নয়। কিন্তু খলিফা আহনাফের কথায় কান দিলেন না। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না, বরং তিনি উটটি ধরার জন্যই ব্যতিব্যস্ত থাকলেন।

দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ এক সময় আহনাফের ওপর খলিফা উমর (রা)-এর নজর পড়ল। খলিফা এবার আহনাফকে ডেকে বললেন, 'আহনাফ ছুটে

এসো, ঐ দেখ, বায়তুলমালের একটা উট ছুটে পালাচ্ছে। ওকে ধরতে হবে। আহ! কত না অনাথ শিশুর অংশ আছে এই উটের মধ্যে! তাড়াতাড়ি এসো। উটটা ধরতে না পারলে ওটা পালাবে যে।'

হযরত উমর (রা)-এর আহ্বান শুনে আহনাফ আরেকবার হতবাক হলেন। তিনি এবার সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, 'জনাব, আপনি বিশ্বজাহানের খলিফা। আপনার মতো লোকের জন্য এ কাজ মানায় না। আপনি উটের পেছনে দৌড়াচ্ছেন। বিষয়টি খুবই খারাপ ঠেকছে, বরং আপনি একটা গোলাম পাঠিয়ে দিন। সে-ই উটটি ধরুক। আপনি দয়া করে থামুন।'

আহনাফের কথা শুনে খলিফা মোটেও খুশি হলেন না। উমর (রা) আহনাফের কথার জবাব দিয়ে বললেন, 'শোন আহনাফ! তুমি গোলামের কথা বললে? তুমি কি জান, আমিও আল্লাহর এক গোলাম। আমার চেয়ে বড় গোলাম আর কে আছে বলো?'

অতিথিরা এতক্ষণ খলিফার এ অবস্থা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। খলিফার কথা শুনার পর সবাই বিস্ময়ে থ হয়ে গেল। অতিথিরা দেখলেন, কী নিরহঙ্কার মানুষ হযরত উমর (রা)।

অর্ধ দুনিয়ার খলিফা হযরত উমর (রা)। অথচ খলিফা হবার মতো অহঙ্কারের লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। নিজেকে সত্যিকার অর্থেই গোলাম বলে ভাবতেন খলিফা উমর (রা)। তিনি ছিলেন সত্যিকারের নিরহঙ্কার মানুষ।

ব ল তে পা রো ?

১. একবার মদীনায় খলিফার সাথে দেখা করতে কারা এসেছিল?

২. মেহমানরা খলিফাকে বাসায় না পেয়ে কী করলেন?

৩. খলিফা কী কাজে ব্যস্ত ছিলেন?

৪. খলিফা আহনাফকে কী বললেন?

৫. অতিথিরা কী বলে ভাবলেন?

ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)। তিনি একজন নিরহঙ্কার মানুষই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল প্রতীক। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি বিষয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। অপরের বিচারের বেলায় তিনি ন্যায়বিচার করতেন এমন নয়। নিজের বেলায়ও তার এই নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিনকার এক ঘটনা। হযরত উমর (রা) বাজার থেকে শখ করে একটা ঘোড়া কিনে আনলেন। ঘোড়াটি ভালো কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ঘোড়সোয়ারকে দায়িত্ব দিলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল ঘোড়াটি বেশ দুর্বল। হাঁটতে গিয়ে একসময় ঘোড়াটি খোঁড়া হয়ে গেল। এ কারণে উমর (রা)-এর মন ভীষণ খারাপ হলো। তিনি শখ করে ঘোড়াটি কিনেছেন। অথচ এটি এমনই দুর্বল যে, তা খলিফার পছন্দ হলো না।

তাই খলিফা উমর (রা) ঘোড়াটি তার মালিককে ফেরত দিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু ঘোড়ার মালিক ছিল ভিন্ন রকম মানুষ। সে ঘোড়াটি ফেরত নিতে অস্বীকার করল।

ঘোড়ার মালিক বলল, 'দেখুন! আমি ঘোড়া বিক্রি করে দিয়েছি। ঘোড়াটি আপনি দেখে পছন্দ করে কিনে নিয়েছেন। এখন তা ফেরত নেয়া আমার কাজ নয়। এটার দায়-দায়িত্ব সবই আপনার।'

বিষয়টি নিয়ে উমর (রা) পড়লেন মহা সমস্যায়। তিনি ঘোড়ার মালিককে ভালোভাবে বিষয়টি বুঝাতে চাইলেন। কিন্তু সে কিছুতেই উমর (রা)-এর কথায় কান দিলো না। উমর (রা)-এর আর করার কিছুই ছিল না। তিনি তো মহান এক খলিফা। তাই তিনি এই বিরোধ মীমাংসার জন্য আদালতের কাছে বিচার চাইলেন।

নিয়মমতো আদালত উমর (রা)-এর মামলা গ্রহণ করলেন। কাজি সাহেব বিচারের দিনক্ষণ ধার্য করলেন। নির্দিষ্ট দিনে কাজির দরবারে বিচার বসল। একপক্ষে মুসলিমজাহানের খলিফা হযরত উমর (রা), আর অন্যপক্ষে ছিল ঘোড়সোয়ার। ঘোড়ার মালিক ছিল সাধারণ একজন প্রজা মাত্র।

আজ কাজির আসনে এসে বসেছেন শুরায়হাব। তিনি ন্যায়বান কাজি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তবে আজকের এই মামলা কাজির জন্য ছিল এক বিরাট পরীক্ষা। কেননা, খলিফা উমর (রা) নিজেই এই মামলার একটি পক্ষ। তাই খলিফার বিচার করা তো কঠিনই বটে। তাই চারদিকে এই বিচার নিয়ে নানান আলোচনা চলছিল। অবশেষে আদালতের কাজ শুরু হলো।

বুদ্ধিমান কাজি উভয়পক্ষের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। দু'পক্ষের দেয়া বক্তব্য নিয়ে বিচক্ষণ কাজি শুরায়হাব কিছুক্ষণ ভাবলেন। এবার তিনি রায় ঘোষণার প্রস্তুতি নিলেন। কাজি সাহেব তার রায়ে বললেন, 'মালিকের অনুমতি নিয়ে ঘোড়াটি পরীক্ষা করা হলে তা হলে মালিক তা ফেরত নিতে বাধ্য থাকত। যেহেতু তা করা হয়নি, তাই ঘোড়াটি ক্রেতা, মানে খলিফাকেই গ্রহণ করতে হবে।'

কাজির এই ঐতিহাসিক রায় গেল খলিফার বিরুদ্ধে। উমর (রা) বিচারে হেরে গেলেন। ফলে এই দুর্বল ও খোঁড়া ঘোড়াটি অবশেষে খলিফাকেই গ্রহণ করতে হলো।

এদিকে ঘটল এক মজার ঘটনা। কাজির রায়ে খলিফা উমর (রা) হেরে গেলেন। অথচ এতে তাঁর মনে মোটেও দুঃখবোধ হলো না, বরং উমর (রা) বিচারক শুরায়হাবের ন্যায়বিচার দেখে মোহিত হলেন।

এত বড় পরাজয়। তাতেও খলিফা ক্ষুব্ধ না হয়ে, বরং উল্টো কাজির পদোন্নতি দিয়ে দিলেন। খলিফা উমর (রা) খুশি হয়ে শুরায়হাবকে কুফার কাজি নিযুক্ত করলেন। ন্যায়বিচারের প্রতি খলিফার এই যে অপূর্ব শ্রদ্ধাবোধ তা দেখে সবাই হতবাক হলো।

ব ল তে পা রো ?

১. খলিফা শখ করে কী কিনেছিলেন?

২. খলিফার ঘোড়াটি কেমন ছিল?

৩. ঘোড়া নিয়ে খলিফা কী সমস্যায় পড়লেন?

৪. খলিফার ঘোড়ার ব্যাপারে কাজি কী রায় দিলেন?

৫. রায় ঘোষণার পর কাজির কী পরিণতি হলো?

উমর (রা)-এর সাদাসিধে জীবন

উমর (রা) ছিলেন বিশাল এলাকার শাসক। অর্ধ দুনিয়াই ছিল তাঁর শাসনের অধীন। আজ পর্যন্ত বিশ্বে যত শাসক এসেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এলাকা শাসন করেছেন উমর (রা)। এত বড় শাসক হলে কি হবে?

অথচ উমর (রা) কোনো চাকচিক্য ও বিলাস পছন্দ করতেন না। তিনি খুব সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। তাঁর পোশাক-আশাক ছিল অতি

সাধারণ। তাঁর পরনের লুঙ্গি ও জামা প্রায়ই তালি দেয়া থাকত। তাও আবার একটা দু'টো তালি নয়। তিনি বারোটি তালি দেয়া জামাও পরেছেন বলে জানা যায়। এগুলো পরেই তিনি শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। তাতে কখনও তাঁর কোনো অসুবিধা হতো না।

হযরত উমর (রা) মুসলিম দুনিয়ার মহান শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান। ফলে তাঁর কাছে প্রায়শই বিদেশী দূতরা দেখা করতে আসত। এসব দূত খলিফার সাথে দু'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করত। অথচ তখনও একই রকম সাদাসিধে পোশাক পরিধান করতেন খলিফা। বিদেশী দূত ও অন্যান্য মেহমানরা খলিফার এই সহজ সরল জীবনযাপন দেখে অনেক সময় আশ্চর্য হয়ে যেত। খলিফা অর্ধ দুনিয়ার মালিক, অথচ তাঁরই কিনা এই অবস্থা!

একবার একদল বিদেশী দূত খলিফার সাথে দেখা করতে এলো। তারা বেশ কিছুক্ষণ ধরে খলিফার অপেক্ষায় বসে রইল। অনেক সময় গড়িয়ে গেল। অথচ খলিফার দেখা পাচ্ছে না তারা। তাই তারা বেশ বিরক্ত হলো। অবাকও হলো খানিকটা।

কেননা, উমর (রা) মুসলিম জাহানের খলিফা। তিনি দায়িত্বশীল মানুষ বলেও বেশ পরিচিত। কোনো কাজে তাঁর এ রকম দেরি হবার কথা নয়। আর এটা কল্পনা করাও যায় না। তাই তারা নানা রকম কথাবার্তা বলাবলি শুরু করল।

এমন সময় খলিফার এক ঘনিষ্ঠজন দূতদের কাছে এগিয়ে আসলেন। তিনি তাদের বিনীতভাবে জানালেন, 'খলিফার একটি মাত্র কাপড়। সেটা ধুয়ে রোদে দেয়া হয়েছে। শুকিয়ে গেলে সেটা পরেই খলিফা আপনাদের সাথে দেখা করতে আসবেন। এ জন্যই খলিফার একটু দেরি হচ্ছে। খলিফা আপনাদের কষ্ট করে অপেক্ষা করতে বলেছেন। এ জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।'

দূতেরা খলিফার লোকের মুখে খলিফার পরিধানের কাপড়ের কাহিনী শুনে অবাক হলো। উমর (রা) মুসলিম বিশ্বের বড় সম্রাট। অথচ তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের এই করুণ অবস্থা? এ কথা যে ভাবাই যায় না।

অথচ খলিফা উমর (রা)-এর জীবনযাপন প্রণালির বাস্তব চিত্র ছিল এটাই। অতি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন খলিফা উমর (রা)।

ব ল তে পা রো ?

১. খলিফা উমর (রা) কী রকম জীবনযাপন করতেন?

২. উমর (রা)-এর কাছে একবার কারা এলো?

৩ সেদিন খলিফার পরিধানের কাপড়ের অবস্থা কেমন ছিল?

৪. খলিফা উমর (রা) কী ধরনের কাপড় পরিধান করতেন?

৫. বিদেশী দূতেরা উমর (রা) সম্পর্কে কেমন ধারণা করল?

চৌকিদার বেশে খলিফা উমর (রা)

হযরত উমর (রা) তখন মুসলিম রাষ্ট্রের খলিফা। নিষ্ঠার সাথে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। বিশাল তাঁর সাম্রাজ্য। প্রায় অর্ধ দুনিয়া শাসন করছেন তিনি। তখন চারদিকে চলছিল ইসলামের জয়-জয়কার। অতীতের ব্যর্থতা ও কালিমা ঝেড়ে ফেলে মানুষ যেন এক নতুন দুনিয়ায় বাস করছিল। ন্যায়বান খলিফা উমর (রা)-এর শাসনে এই অনাবিল সুখ-শান্তি যেন আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। তখন প্রজাদের দিন কাটছিল আরাম-আয়াসে। দেশের সর্বত্র বিরাজ করছিল নিরাপত্তার এক স্বপ্নিল আবহ।

সেই সোনালী যুগের এক চমৎকার ঘটনার কথা বলছি। ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী তখন মদীনায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে দূর-দূরান্ত থেকে প্রায়ই ব্যবসায়ীরা আসে রাজধানীতে। অনেক সময় বিদেশ থেকেও ব্যবসায়ীরা আসে মদীনায়। রাজধানীর সাথে বাণিজ্যের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। এ ধরনের এক বিদেশী ব্যবসায়ী কাফেলা একদিন আসছিল মদীনার উদ্দেশে। কিন্তু সময়ে কুলাতে না পেরে তারা মদীনার উপকণ্ঠে এসে তাঁবু গাড়ল। এদের সবাই ছিল ভালো ব্যবসায়ী। তাদের সাথে ছিল অনেক নামীদামি মালামাল। ব্যবসায়ীরা মদীনার উপকূলে পৌছার আগেই পথিমধ্যে সন্ধ্যা নেমে এলো। তাই তারা মদীনা শহরে পৌছার সুযোগ পেল না।

অনেক দূর থেকে এসেছে এসব ব্যবসায়ী। তাই পথের ধকলে তারা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। নিরুপায় হয়ে ব্যবসায়ীরা মদীনার উপকণ্ঠেই তাঁবু গাড়ল। এখানেই তারা রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

এটি ছিল মরুভূমির পাহাড়ী এলাকা। তাই ব্যবসায়ীরা অনেকেই চোর-ডাকাতের আক্রমণের ভয় পাচ্ছিল। পালাক্রমে পাহারা বসিয়ে রাত কাটাবে সেই সুযোগও তাদের ছিল না। কেননা, তাদের সবাই ছিল বেশ ক্লান্ত - পরিশ্রান্ত। ফলে ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিল। কাফেলার এই করুণ অবস্থার খবর হযরত উমর (রা)-এর কানে গেল।

খবর শুনে খলিফা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, মদীনার উপকণ্ঠে বাণিজ্য কাফেলার কোনো ক্ষতি হলে তা নিয়ে খলিফার বদনাম হবে। তা ছাড়া ব্যবসায়ীরা ডাকাতের পাল্লায় পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে ফেললে তারা মদীনার সাথে আর ব্যবসা করতে সাহস পাবে না। এতে রাষ্ট্রের ইমেজ যেমন নষ্ট হবে, তেমনি দেশের পণ্য বাজারও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এইসব নানা সমস্যার কথা ভেবে হযরত উমর (রা) উদ্বিগ্ন হলেন। এই সমস্যা নিয়ে কী করা যায়, তা তিনি ভাবলেন। অনেক ভেবেচিন্তে শেষমেশ এক সিদ্ধান্ত নিলেন খলিফা। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী আবদুর রহমান বিন আউফকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন কাফেলার কাছে।

তারা ঠিক করলেন, দু'জন মিলে রাতভর কাফেলাকে পাহারা দেবেন। পালাক্রমে তাঁবু পাহারা দিয়ে রাত কাটিয়ে দিলে তেমন কোনো কষ্ট হবে না। তাই যেই ভাবনা সেই কাজ। হযরত উমর (রা) ও আউফ (রা) মিলে সারারাত ব্যবসায়ীদের তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে প্রহরায় কাটালেন। এই খবর কাফেলার লোকেরা মোটেও জানত না।

মুসলিম জাহানের অনন্য বাদশাহ উমর (রা)। বাদশাহ হলে কী হবে? তিনি যে ছিলেন প্রজাবৎসল মানুষ। তাই বাদশাহ হয়েও আজ দারোয়ান-চৌকিদার বেশে রাত কাটালেন। এক অসহায় কাফেলার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. মদীনার উপকণ্ঠে একবার কী এলো?

২. বিদেশী কাফেলা কোথায় তাঁবু গাড়ল? তারা ভয় পাচ্ছিল কেন?

৩. হযরত উমর (রা) কাফেলার জন্য কী করলেন?

৪. উমর (রা)-এর সাথে আর কোন সাহাবী ছিলেন?

মহান সেবক উমর (রা)

আমিরুল মুমেনীন হযরত উমর (রা)। মুসলিম দুনিয়ার খলিফা তিনি। অর্ধ দুনিয়ার বাদশাহ হয়েও তাঁর মনে কোনো অহঙ্কার ছিল না। খলিফা হলে কী হবে? তিনি সব সময় ভাবতেন তাঁর দায়িত্ব নিয়ে, জনগণের সেবার কাজ নিয়ে। জনগণের খেদমত ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবতে পারতেন না। তাঁর মনপ্রাণ সবই প্রজাদের সুখ-দুঃখ নিয়েই আবর্তিত হতো।

খলিফা হবার পর সারাদিন তিনি রাষ্ট্রের শাসন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিভাবে জনগণের সেবা করা যায় তা নিয়েই উমর (রা) যত চিন্তা-ভাবনা

করতেন। রাতের বেলায়ও তিনি জনগণের চিন্তা থেকে বিরত ছিলেন না। অনেক সময় রাতের বেলায় তিনি ঘুমোতেন না। প্রায় প্রতিরাতে তিনি মদীনা শহরের পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে জনগণের সমস্যা জানার চেষ্টা করতেন।

এমনি একরাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন খলিফা উমর (রা)। সেই সময়ের এক ঘটনা। খলিফা ঘুরে বেড়াচ্ছেন মদীনার পথে একাকী। ঘুরতে ঘুরতে খলিফা এক সময় এক তাঁবুর সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁবুর ভেতরে তখন ক্ষীণ একটি আলোর মতো জ্বলছিল। খলিফা এগিয়ে গেলেন। কাছে যেতেই দেখলেন তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করছে এক যুবক। সে বিষণ্ন মনে বসে বসে কী যেন ভাবছিল।

খলিফা অনেকক্ষণ ধরে যুবককে পর্যবেক্ষণ করলেন। খানিক পর তাঁবুর ভেতর থেকে এক নারী কণ্ঠের করুণ কাতরানি ভেসে এলো। কাতরানির শব্দ শুনে খলিফা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মন আনচান করে উঠল। খলিফা যুবকটির আরও কাছে এগিয়ে গেলেন। তাকে এই কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যুবকটি খলিফাকে চিনত না। তারপরও সে আগন্তুকের প্রশ্ন শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল। যুবকটি অনেকক্ষণ আর কিছুই বলতে পারল না।

তারপর কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে জানাল 'তাঁবুর ভেতর আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে। তার জন্য দাই আনা

দরকার। অথচ দাই আনার মতো সঙ্গতি আমার নেই। আল্লাহ জানেন আমার স্ত্রী বাঁচবে কি না।'

যুবকের কথা শুনে খলিফা খুব মর্মাহত হলেন। তিনি ব্যথিত হলেন এ জন্য যে, এই যুবকের খবর তিনি আগে থেকেই জানতে পারলেন না।

খলিফা এবার নিজেকে সংযত করে নিয়ে যুবককে বললেন, 'ভাই, তুমি ধৈর্য ধরো, চিন্তা করো না, আল্লাহই তোমার সমস্যা দূর করে দেবেন। তুমি এখানটায় অপেক্ষা করো। আমি এখনই ফিরে আসছি। দেখি তোমার কোনো উপকার করতে পারি কিনা।'

এই কথা বলেই খলিফা দ্রুত বাসায় ফিরে এলেন। একটু পরে তিনি নিজের স্ত্রীকে সাথে নিয়ে তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলেন। উমর (রা)-এর স্ত্রী তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং প্রসব বেদনায় কাতর মহিলার সেবায় লেগে গেলেন। খলিফা উমর (রা) ছিলেন বেশ সচেতন এবং বুদ্ধিমান মানুষ। তাই যাবার সময় তিনি সাথে করে সামান্য খাবার নিয়ে গেলেন। খাবারগুলো যুবকের হাতে তুলে দিলেন।

যুবক বেশ ক্ষুধার্ত ছিল। খাবার পেয়ে তাঁবুর বাইরে বসে এই খাবার তৃপ্তিসহকারে খেয়ে নিলো যুবক।

তারপর দু'জন বসে বসে গল্প করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁবুর ভেতর থেকে এক নবজাতকের কান্নার আওয়াজ বাতাসে ভেসে এলো। শব্দ শোনার সাথে সাথে যুবকটি নেচে উঠল। সাথে খলিফাও দারুণ খুশি হলেন। তাঁর চোখেমুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। যুবক ও তার স্ত্রীর সেবা করে খলিফা যে আনন্দ পেলেন তা আর কে দেখে!

যুবকটি তার সেবক লোকটিকে চিনত না। এতক্ষণ সে উমর (রা)-এর অনেক সমালোচনা করেছে। আগন্তুক লোকটার সাথে গল্প করার সময় সে বলছিল- 'উমর খলিফা হবার অযোগ্য। তার রাজ্যে থেকে প্রজারা কোনো উপকার পায় না। তাদের কষ্ট লাঘব করার কোনো ব্যবস্থা করেন না এই খলিফা।'

উমর (রা) এতক্ষণ যুবকের কথাই শুনে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলেন। যুবকের সব কথাই তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন ও হজম করলেন। এবার যুবকের কাজ শেষ করে উমর (রা) ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক তখনই খলিফা তাঁর আসল পরিচয় যুবকের কাছে প্রকাশ করলেন।

হযরত উমর (রা) এখন যুবকের সামনে। তিনিই তার স্ত্রীকে বাঁচিয়েছেন। এখন খলিফার পরিচয় পেয়ে লজ্জায় যুবকটির মুখ লাল হয়ে গেল। এতক্ষণ সে কতই না সমালোচনা করেছে মহামতি খলিফার! খলিফার পরিচয় জানার পর যুবকটি বিনীতভাবে খলিফার নিকট ক্ষমা চাইল। অথচ খলিফা কী মহান! তিনি বরং তাঁর অপারগতার কথা যুবককে জানালেন।

উমর (রা) বললেন, 'না যুবক, তুমি কোনো অন্যায় করোনি, বরং আমি সময়মতো তোমাদের খোঁজ নিতে পারিনি বলে তোমরা অনেক কষ্ট পেয়েছ। এতে তোমাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তোমাদের খবর রাখতে পারিনি বলে বরং আমারই তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

যুবকটি খলিফার কথাগুলো অবাক বিস্ময় নিয়ে শ্রবণ করছিল। আর সে হতবিহ্বল হয়ে যাচ্ছিল। কী মহান মানুষই না ছিলেন খলিফা উমর (রা)!

ব ল তে পা রো ?

১. একদিন রাতে ঘুরতে গিয়ে খলিফা কী দেখলেন?

২. যুবকের কী সমস্যা হচ্ছিল?

৩. যুবকের স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা কে করলেন?

৪. যুবক খলিফার কাছে কী অভিযোগ করল?

৫. যুবকের অভিযোগের জবাবে খলিফা কী বললেন?

গরীব-দুঃখীর চিন্তায় উমর (রা)

হযরত উমর (রা) অনেক বড় খলিফা ছিলেন। তবে তাতে কী। তিনি নিজের জন্য কিছুই ভাবতেন না। তিনি ছিলেন দুঃখী ও অভাবী মানুষের পরম বন্ধু। মানুষের সেবায় তিনি ছিলেন সর্বদা তৎপর। গরিব ও অসহায় মানুষের কেউ উমর (রা)-এর কাছে এসে খালি হাতে ফেরত যেত না।

হযরত আবু বকর (রা) ইন্তেকাল করার পর হযরত উমর (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। এখন তাঁর ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার বিরাট দায়িত্ব। রাষ্ট্রের অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। তা ছাড়া দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ সমস্যাও তাঁকে ব্যস্ত রাখত। এ জন্য তাঁকে দিনরাত কাজ করতে হতো।
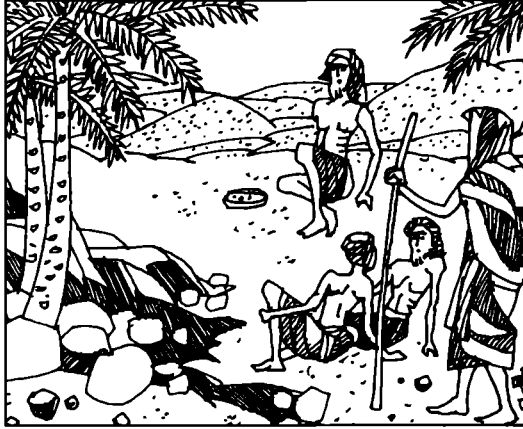
খলিফা হলে কী হবে? এতে উমর (রা)-এর জীবনে কিন্তু কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। তাঁর পোশাক-আশাক, খাওয়া-পরা এবং ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন এলো না। খলিফা হবার পর তিনি গরিব, দুঃখী ও অসহায় মানুষকে ভুলে যাননি। কারও দুরবস্থার খবর পেলে তিনি তাদের সাহায্যে ছুটে যেতেন সেখানে।

খলিফা উমর (রা)-এর শাসনামলে দেশে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। দেশের সর্বত্র খাবারের প্রচণ্ড অভাব শুরু হলো। চারদিকে বিশাল জনমানুষের হাহাকার পড়ে গেল। এতে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। এই অবস্থা খলিফার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দেখে হতাশ হয়ে পড়লেন। জনগণের অভাব-অনটন ও করুণ অবস্থা তাঁকে অস্থির করে তুলল।

দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিজে খাবার-দাবারে সংযত হলেন। জনগণের অভাব অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দেখে তিনি গোশত ও ঘি খাওয়া ছেড়ে দিলেন।

যতদিন দেশে দুর্ভিক্ষ ছিল ততদিন তিনি এইসব স্পর্শও করেননি। কথিত আছে যে, এই জাতীয় দুর্যোগের সময় তিনি চুপিসারে কাঁদতেন এবং এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহতাআলার সাহায্য কামনা করতেন।

অনেকদিন পর এক সময় দুর্ভিক্ষ আপনা থেকেই কেটে গেল। ধীরে ধীরে খাদ্যের অভাব দূরীভূত হলো। এখন মানুষের মনে আর কোনো কষ্ট নেই। সবাই হাসি আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

খলিফার ভৃত্য ছিল আসলামা। একদিন তিনি দুর্ভিক্ষ নিয়ে কথা বলছিলেন। আসলামা বললেন, 'আল্লাহকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ দুর্ভিক্ষ থেকে দেশকে মুক্ত করেছেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের খলিফা খানাপিনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তিনি সব সময় কাঁদতেন। দুর্ভিক্ষ দূর না হলে হয়তো খলিফা না খেয়ে এবং দুশ্চিন্তায় মারা যেতেন।'

কী মহান মানুষ ছিলেন খলিফা উমর (রা)। প্রজাদের জন্য তাঁর এমন দরদ কি কল্পনা করা যায়!

ব ল তে পা রো ?

১. একবার দেশে কী ধরনের সমস্যা দেখা দিলো?

২. খলিফা এ সময় কিভাবে কাটালেন?

৩. দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলে ভৃত্য আসলামা কী বলেছিলেন?

রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালোবাসা

৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ। কাদেসিয়া প্রান্তরে পারসিকদের সাথে মুসলমানদের এক ভয়াবহ লড়াই হলো। সেই যুদ্ধে সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব নিলেন। আর পারসিকদের সেনাপ্রধান ছিলেন রুস্তম। পারসিক সেনারা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার। আর মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার।

শুধু সংখ্যার দিক থেকে পারসিকরা বেশি ছিল তাই নয়, তারা ছিল আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ সামগ্রীতে মুসলিম বাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি বলীয়ান। তবে তাদের বুকে ঈমানের অমিত শক্তি ও সাহস ছিল না। তাই মুসলিম বাহিনী ছোট হলেও তাদের সাথে ছিল মহান আল্লাহর সহায়তা ও গায়েবী মদদ।

মুসলিম বিশ্বের খলিফার দায়িত্ব তখন হযরত উমর (রা)-এর ওপর। তিনি সেনাপতিকে সাহসের সাথে লড়াই করার জন্য দোয়া করে দিলেন। তিনদিন ধরে বিশাল পারসিক বাহিনীর সাথে লড়াই হলো ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর। আল্লাহর কী শান! মুসলিম বাহিনী পারসিকদের সকল বাধা অতিক্রম করে লড়াইয়ে বিজয়ী হলো।

কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় পারসিকদের মনোবল একেবারে ভেঙে দিলো। আর মুসলমানদের হিম্মত আরও বেড়ে গেল। যুদ্ধের পরপরই হযরত উমর (রা) বায়তুলমাল থেকে ভাতা নির্ধারণের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন। এই ভাতা নির্ধারণ নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে নানা ধরনের কথাবার্তা চলছিল। কথা হচ্ছিল ভাতার পরিমাণ কিভাবে ও কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে। আর এটা নিয়ে চারদিকে চলছিল ঘোর বিতর্ক।

কেউ কেউ বলল, যারা অভিজাত গোত্রের লোক তাদের ভাতা বেশি হওয়া উচিত। কেউ কেউ দাবি করল, যারা সবচেয়ে বেশি জেহাদে অংশ নিয়েছে

তাদের ভাতা বেশি হওয়া উচিত। কেউ বুঝাল, ভাতা সবচেয়ে কম হবে দাসদাসীদের। কেননা, তারা সবার নিচে এবং তাই তাদের ভাতাও হবে সর্বনিম্ন। কেউ আবার বয়স্কদের কথা বললেন। তাদের কাজ করার ক্ষমতা নেই। তারা আয়-রোজগার করতে পারেন না। তাই বলে ভাতা তাদেরই বেশি হওয়া জরুরি। কেউ কেউ আবার বললেন অন্য কথা। তাদের মত ছিল, ইসলামের কাজে ও দাওয়াতে দীনের প্রসারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের ভাতা বেশি হওয়া দরকার।

এভাবে আলোচনা সর্বত্র বেশ জমে উঠল। খলিফা হযরত উমর (রা) সব আলোচনার বিষয়ে অবগত হলেন। তিনি সবার মতামত আমলে নিলেন। কারও মতই তিনি খাটো করে দেখলেন না। তবে এতসব মতের সাথে তিনি একমত হতে চাইলেন না। তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়বান মানুষ। তাই ন্যায়নীতি ও সততাকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেন। খলিফা উমর (রা) ইসলামে যাদের অবদান তাদেরকেই ভাতা বেশি দেওয়ার পক্ষে মত দিলেন।

খলিফা উমর (রা) ধর্মীয়ভাবে অগ্রসর এবং দীনের ব্যাপারে ভূমিকা পালনকারী সাহাবীদের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ভাতা নির্ধারণের কাজটি সমাধা করতে চাইলেন। এই হিসেবে সবচেয়ে বেশি ভাতা পেলেন মুহাম্মদ (সা)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা)। তিনি পেলেন সর্বোচ্চ ভাতা। তাঁর মাসিক ভাতা নির্ধারণ করা হলো পঁচিশ হাজার দিরহাম।

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সাহাবীর ভাতা পাঁচ হাজার দিরহাম করে নির্ধারণ করা হলো। খলিফা তাঁর আপনজনদের ভাতাও ঠিক করে দিলেন। সেই অনুযায়ী খোদ উমর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহর ভাতাও ঠিক করা হলো। কিন্তু তাঁর ভাতার পরিমাণ তার ভাতা ক্রীতদাস যায়েদের পুত্র উসামার চেয়ে কম করা হলো। এতে আবদুল্লাহ বিস্মিত হলেন এবং ভীষণ মনক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি পিতার ওপর ভীষণ রাগ করে বসলেন। একদিন রাগতস্বরে আবদুল্লাহ পিতা উমর (রা)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আবদুল্লাহ বললেন,'হে আমার প্রাণপ্রিয় পিতা! আমি কি উসামার চেয়েও অকর্মণ্য ও অযোগ্য যে, আমার ভাতা উসামার চেয়েও কম হতে হবে ? আপনিই বলুন, আমি কী উসামার চেয়ে ভালো ভাতা পেতে পারি না?'

পুত্র আবদুল্লাহর কথার জবাবে তিনি শুধু একটি কথাই বললেন, 'দেখ আমার প্রাণাধিক প্রিয় ছেলে, তোমার সব কথা আমি শুনলাম। তবে তুমি

ভুলে যেও না যে, মহানবী (সা) তোমার চেয়ে উসামাকেই বেশি ভালোবাসতেন। মহানবী (সা)-এর প্রতি উমর (রা)-এর যে প্রচণ্ড রকম আবেগ ও গভীর ভালোবাসা ছিল এ ঘটনাই তার প্রমাণ।

ব ল তে পা রো ?

১. কাদেসিয়ার যুদ্ধে কোন কোন শক্তি লড়াই করেছিল?

২. কাদেসিয়ার লড়াইয়ে কতজন মুসলিম সেনা অংশ নিয়েছিল?

৩. মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি এবং খ্রিষ্টান সেনাপতিদ্বয়ের নাম কী?

৪. ভাতা হিসেবে কে কত টাকা লাভ করেছিল?

৫. উমর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহর কী অভিযোগ ছিল?

এক নজরে উমর (রা)

৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দ	:	আদ্দিয়া নামক গোত্রে উমর (রা) জন্মগ্রহণ করেন।
৬০৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	উমর (রা) ৩৩ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।
৬২২ খ্রিষ্টাব্দ	:	উমর (রা) মদীনায় হিজরত করেন।
৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ	:	উমর (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী আযানের সূত্রপাত হয়।
৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	বদর যুদ্ধে বারোজন সাহাবীসহ অংশগ্রহণ করেন।
৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ	:	উমর (রা) ওহুদ যুদ্ধে অংশ নেন।
৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ	:	হোদায়বিয়ার সন্ধির বিরোধিতা করেন। পরে অবশ্য সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন।
৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ	:	খায়বর যুদ্ধে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ	:	তাবুক অভিযানে উমর (রা) অর্ধেক সম্পদ দান করেন।
৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ	:	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিদায় হজে উমর (রা) মক্কা

		যাত্রা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হযরত আবু বকর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন।
৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	হযরত আবু বকর (রা) ইন্তেকাল করেন। উমর (রা) দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।
৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ	:	সেনাপতি মুসান্নার নেতৃত্বে পারস্য বিজিত হয়। সেনাপতি খালেদ দীর্ঘদিন অবরোধের পর দামেস্ক দখল করেন।
৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ	:	জালুলার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা বায়তুল মাকদাস অধিকার করেন।
৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	:	আমওয়াসের মহামারীতে আবু উবায়দা ও মুআযসহ কয়েক হাজার সৈন্যের মৃত্যুবরণ।
৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ	:	আমর ইবনে আস মিসর জয় করেন। নিহওয়ান্দের যুদ্ধে পারসিকদের সাথে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে।
৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ	:	খলিফার নির্দেশে আমের সুয়েজখাল খনন করেন এবং নীলনদের সাথে লোহিত সাগরকে যুক্ত করা হয়।
৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ	:	হযরত উমর (রা) ২৭ জিলহজ শাহাদাতবরণ করেন।

তথ্য কণিকা

প্রশ্ন : উমর (রা) কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর : ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে হযরত উমর (রা) আরবের কুরাইশ বংশের আদ্দিয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন : তাঁর আসল ও ডাক নাম কী?

উত্তর : তাঁর মূল নাম উমর। আবু হাফস তাঁর ডাক নাম।

প্রশ্ন : উমর (রা)-এর পিতা ও মাতার নাম কী?

উত্তর : উমর (রা)-এর পিতার নাম খাত্তাব। মাতার নাম হানতামা।

প্রশ্ন : উমর (রা)-এর গুণবাচক নাম কী?

উত্তর : তাঁর গুণবাচক নাম ফারুক। এর অর্থ সত্য-মিথ্যা প্রভেদকারী।

প্রশ্ন : কার শাসনামলে প্রথম জেলখানা স্থাপিত হয়?

উত্তর : হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে আরবে প্রথম জেলখানা স্থাপিত হয়। এটাই দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম জেলখানা।

প্রশ্ন : কে মদ্যপানের জন্য আশিটি বেত্রাঘাত প্রথা চালু করেন?

উত্তর : হযরত উমর (রা) মদ্যপানের জন্য আশিটি বেত্রাঘাতের দণ্ড চালু করেন।

প্রশ্ন : উমর (রা)-এর সাম্রাজ্য কয়ভাগে বিভক্ত ছিল?

প্রশ্ন : কেউ মিথ্যা কথা বললে কে বুঝতে পারতেন?

উত্তর : কেউ কোনো মিথ্যা কথা বললে হযরত উমর (রা) তা সাথে সাথে বুঝতে পারতেন।

প্রশ্ন : কার আঘাতে ভূমিকম্প বন্ধ হয়েছিল?

উত্তর : মদীনায় ভূমিকম্প শুরু হলে উমর (রা)-এর লাঠির আঘাতের সাথে সাথে ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন : শয়তান কার বিপরীত পথে চলত?

উত্তর : উমর (রা) যে পথে চলতেন শয়তান তার বিপরীত পথে চলত।

প্রশ্ন : মসজিদুন নববীর সম্প্রসারণ করেন কে?

উত্তর : সর্বপ্রথম মসজিদুন নববীর সম্প্রসারণ করেন হযরত উমর (রা)।

প্রশ্ন : মসজিদে আযান দেয়ার প্রথা কে প্রথম চালু করেন?

উত্তর : হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শে।

প্রশ্ন : চাকরিতে পেনশন প্রথা কে চালু করেন?

উত্তর : চাকরিতে পেনশন প্রথা চালু করেন উমর (রা)।

প্রশ্ন : প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা প্রথা কে চালু করেন?

উত্তর : হযরত উমর (রা)।

প্রশ্ন : চেক প্রথম কে চালু করেন?

উত্তর : উমর (রা) সরকারি চাকুরেদের জন্য 'চেক' প্রথার ব্যবস্থা করেন।

প্রশ্ন : জমি জরিপের প্রথা কে চালু করেন?

উত্তর : জমি জরিপের প্রথা হযরত উমর (রা) চালু করেন।

প্রশ্ন : কে সর্বপ্রথম আমীরুল মোমেনীন উপাধিতে ভূষিত হন?

উত্তর : উমর (রা) সর্বপ্রথম আমীরুল মোমেনীন উপাধিতে ভূষিত হন।

প্রশ্ন : উমর (রা) কখন শাহাদাতবরণ করেন?

উত্তর : হযরত উমর (রা) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদাতবরণ করেন।

প্রশ্ন : মিসর বিজয়ে সেনাপতি কে ছিলেন?

উত্তর : আমর বিন আস।

প্রশ্ন : উমর (রা) প্রথম জেলখানা কোথায় স্থাপন করেন?

উত্তর : মক্কায়।

প্রশ্ন : উমর (রা)-এর কবরস্থান কোথায়?

উত্তর : হযরত আয়েশার (রা) কক্ষে।

প্রশ্ন : খলিফাদের মধ্যে কে অমুসলিমের হাতে শাহাদাতবরণ করেন?

উত্তর : উমর (রা)।

প্রশ্ন : উমরের (রা) জানাযার নামায কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : মসজিদুন নববীতে।

প্রশ্ন : উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের আগে কতজন মুসলমান ছিল?

উত্তর : ৪০-৫০ জন।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর উমর (রা) কত বছর মক্কায় ছিলেন?

উত্তর : সাত বছর।